প্রকৃতি থেকে শেখা

উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে পরিবেশসম্মত
কৃষির নির্দেশিকা

মূল রচনা: শিমপেই মুরাকামী
অনুবাদ : মনিতোষ হাওলাদার

পুনঃমুদ্রণ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

অংকন
মারী মুরাকামী

ছবি
সিমপেই মুরাকামী

সম্পাদনা
খালেদ চৌধুরী

তত্বাবধানে
মিজ নার্গিস জাহান বানু

কম্পিউটার বিন্যাস
মোঃ জিয়া উদ্দিন
ইদ্রিস হোসাইন

প্রকাশক
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

মুদ্রণে
এভারগ্রীণ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

গ্রন্থ স্বত্ব
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
আই/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মুল্যঃ একশত টাকা

কেবল ফসল উৎপাদনই নয়, কৃষির চুড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক গুনাবলীর উৎকর্ষ সাধণ

মাসানোবু ফুকুয়োকা
(তৃণখণ্ডে বিপ্লব)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বইটি লেখার ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন তাঁদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক কাজী ফারুক আহম্মদ এ বইটির জন্য নৈতিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন। আমার বন্ধুপ্রতিম মনিতোষ হাওলাদার প্রশিকার পরিবেশসম্মত কৃষি খামারটির যাবতীয় উন্নয়নের জন্য আমার সঙ্গে কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলাদেশে আমার কাজের ব্যাপারে কিউসো-এর দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক জুলিয়ান ফ্রান্সিস আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁদের সহায়তা ছাড়া বইটি প্রকাশ হতোনা। বইটির লে-আউট, সংশোধন ও সম্পাদনার জন্য উইলমা ভ্যান বারকেলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইটির চিত্রাদি অংকনের জন্য আমার স্ত্রী মারীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বশেষে আমাদেরকে বাংলাদেশে কাজা করার জন্য জাপানের যে সকল মানুষ নৈতিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেরন তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিষয়সূচি

প্রথম অংশ: পূর্বকথা

ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিশ্ব প্রকৃতি এবং কৃষি ১৫

১.১ প্রাকৃতিক অনণ্যের পরিবেশ পদ্ধতি

১.২ কৃষি ও প্রাকৃতিক অরণ্যের পার্থক্য

১.৩ পানি

১.৪ উষ্ণমণ্ডলীয় পরিবেশ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মাটি ৩৩

২.১ মাটি কী?

২.২ মাটির কাজ ও গুণাবলী

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ রাসায়নিক কৃষি অনুশীলননে সৃষ্ট সমস্যাবলী ৪২

৩.১ পরিবেশগত সমস্যা

৩.২ অর্থনৈতিক সমস্যা

৩.৩ সামাজিক সমস্যা

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ পরিবেশসম্মত কৃষির নীতিমালা ৫৪

৪.১ বৈচিত্র্য

৪.২ প্রাণবন্ত মাটি

৪.৩ পুনঃপ্রাণন

৪.৪ বহুস্তর বিশিষ্ট কাঠামো

ছবি সংবলিত পৃষ্ঠা ৬২

দ্বিতীয় অংশ: ব্যবহারিক বিষয়াবলী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মাটির উর্বরতা বিধান এবং তা অক্ষুণ্ন রাখা **৬৩**

৫.১ মাটির উর্বরতা বিধান এবং তা অক্ষুণ্ন রাখার মূলসূত্র
৫.২ জাবড়া প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্প কর্ষণ
৫.৩ সবুজ সার
৫.৪ কম্পোষ্ট
৫.৫ খামারের সীমানা বরাবর গাছ ও ঘাস লাগানো

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: শস্য চাষ পদ্ধতি **৮৩**

৬.১ বর্তামান শস্যচাষ পদ্ধতির সমস্যা
৬.২ বিকল্প শস্য চাষ পদ্ধতি
৬.৩ বিচিত্র ফসলের আবাদ
৬.৪ শস্যাবর্তন/শস্য পর্যায়
৬.৫ মিশ্র ফসলের আবাদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ: রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা **৯৪**

৭.১ আপদ বলতে কী বুঝায় এবং এদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাটি কী?
৭.২ রাসায়নিক পদ্ধতিতে আপদ দমনের ফলে উদ্ভূত দুষ্টচক্র
৭.৩ পরিবেশসম্মত উপায়ে রোগ বালাই ব্যবস্থাপন
৭.৪ আগাছা

অষ্টম পরিচ্ছেদ: নিজস্ব খামারে বীজ উৎপাদন করা **১০৬**

৮.১ উফশী জাতের বীজ, সংকর জাতের বীজ এবং বাজার থেকে ক্রয় করা বীজের সমস্যা
৮.২ নিজস্ব খামারে বীজ উৎপাদনের সুবিধা
৮.৩ নিজস্ব খামারে বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া

প্রকৃতি থেকে শেখা

পূর্বকথা

আমরা যেটাকে উকোসিস্টেম বলি সেটাকে সৃষ্টি করার জন্য প্রকৃতি কোটি কোটি বছর ধরে মাটি, জল, বায়ু, বন, সূর্যালোক এবং সকল প্রানীর মধ্যে বিনিময় এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার একটা জটিল সর্ম্পক-পদ্ধতি গড়ে তুলেছে। ইকোসিস্টেম হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর সকল জীবন্ত বস্তুর প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা কেবল প্রতিদিনের প্রয়োজনই মিটায় না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ সঞ্চয়ও করে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের আগ্রাসনের ফলে আজ এই প্রাণ রক্ষা ব্যবস্থা বিপন্ন। গত কয়েক দশাব্দে এই আগ্রাসন অভূতপূর্ব মাত্রায় বেড়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিজের তথাকথিত সাফল্যে অন্ধ হয়ে মানুষ এখন বিশ্বাস করছে প্রকৃতিকে সে 'জয় করবে' এবং নিজের স্বার্থে প্রকৃতিকে অশেষভাবে ব্যবহার করতে পারা যাবে। এটা ঔদ্ধত্য এবং হিংস্র লোভ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারে শতপ্রকারে দম্ভোক্তি করেও মানুষ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতর বিজ্ঞানকে বুঝতে পারছে না। এই বিভ্রান্তির ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে শত্রুতার মতো। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে মানুষ এবং অন্য সকল প্রাণী নিশ্চিত বিলুপ্তির মুখোমুখী হবে। ইতোমধ্যেই সেই ধ্বংস- লক্ষণের পূর্বাভাষও প্রকট হচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, এসিড-বৃষ্টি হচ্ছে, ওজোন-স্তরে শূন্যতা ঘটতে শুরু করেছে, ব্যাপকভাবে বন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, মরুভূমির প্রসার ঘটছে, খরা অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘতর হচ্ছে, হিংস্র দস্যুর মতো বন্যা আর প্রলয়তুল্য ঘুর্ণিঝড় পৃথিবীর বহু এলাকায় নির্মম বিনাশ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান বিষয়ে মানুষের ঔদ্ধত্যই পরিবেশ ধ্বংস হওয়ার একমাত্র কারণ নয়; মানুষ যেভাবে সমাজ গঠন করেছে- নিজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তা-ও পরিবেশ ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমগ্র সম্পদের ওপর অল্প ক'জনের একচেটিয়া মালিকানা উৎসাহিত করছে; সমাজব্যবস্থা বহু মানুষকে অধিকারবঞ্চিতি করে অল্প ক'জনের হাতে ক্ষমতার দখল তুলে দেওয়ার আয়োজন করে রেখেছে; সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নামে লোভ এবং দায়িত্বহীন ভোগের পক্ষে ওকালতি করছে।

শুভবুদ্ধির জয় না হলে মানুষ অল্পকালের মধ্যেই পরিবেশকে ধ্বংস করে ফেলবে- সেই

সঙ্গে ধ্বংস করবে নিজেকে এবং অন্য সকল জীবজন্তু ও প্রাণীকে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষকে এমন একটা সমাজ গড়ে তুলতেই হবে যা সম্পদের সমতা ওস্থায়িত্বশীল বন্টনব্যবস্থার ওপর ভিত্তিশীল হবে, যা সামাজিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিকত করবে এবং ভোগকে নিয়ন্ত্রনণ করবে প্রয়োজন অনুসারে অল্প ক'জনের লোভ অনুসারে নয়। মানুষর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবশ্যই প্রকৃতির মূলসত্রাবলী এবং নিয়মগুলি বিশদভাবে বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং মানুষের বিজ্ঞান ওপ্রযুক্তিকে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্নভাবে মিশিয়ে মানুষকে রক্ষার স্থায়ি ধরনের ব্যবস্থা করতে হবে।

জনাব শিমপেই মুরাকামি রচিত 'প্রকৃতি থেকে শেখা' শীর্ষক বইটি প্রকৃতির নিয়ম ও মূলসূত্রাবলী আরো ভালোভাবে বুঝবার ব্যাপারে এবং স্বাসস্থ্যকর, পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়িত্বশীল একটি বিকল্প র্কষি পদ্ধতি গড়ে তুলবার প্রচেষ্টায় প্রকৃতির নিয়ম ও মূলে সূত্র উত্তমরুপে কাজে লাগানোর ব্যাপারে একটি অতিশয় প্রশঙসনীয় উদ্যেগ। জাপানে দীর্ঘকাল কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রশিকার প্রাকৃতিক কৃষি খামারে ৩ বছরের অভিঙ্গতা তাঁর এই বইটিকে অভিশয় প্রয়োগমুখী করে তুলেছে। প্রতিটি প্রয়োগের পেছনে যেসব ইকোলজিক্যাল মূল সূত্র রয়েছে সেগুলিকে তিনি খুবই যত্নশীলতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলাদেশের কৃষি প্রসঙ্গে রচিত বলে এই বইটি বাংলাদেশের পরিবেশসম্মত কৃষির অনুশিলনকারীদের জন্য খুব বেশী সহায়ক হতে পারে। এছারা , বাংলাদেশের পরিবেশবাদীরাও এই বইটি থেকে জানতে পারবেন রাসায়নিক কৃষি বিভাবে কৃষির প্রধান সম্পদ মাটি,জল, জৈব বৈচিত্র্য ইত্যাদির ক্ষতি সাধন করেছে। পরিবেশ সংত্রুান্ত অন্যান্য বইয়ের মতো, এই বইটিতে জনাব মুরাকামি কেবল সমস্যার বিবরণ দিয়েই খেমে যাননি। তিনি বিকল্প সম্পর্কেবিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং প্রয়োগ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ দিযেছেন। সর্বোপরি, বইটি পড়ে সবাই আশাবাদী হবেন পরিবেশের যে বিপুল ক্ষতি হযেছে এবয় হয়ে চলেছে, তার যোগ্য বিকল্প আছে। তিনি কেবল তত্ত্ব দিয়ে নয়, প্রয়োগের মাধ্যমেও প্রমান করেছেন যে, এই বিকল্প কৃষি পরিবেশের দিক থেকে যেমন অনুকূল,তেমনিই,রাসায়নিক কৃষির তুলনায়। অধিকতর ইৎপাদনশীল এবং স্থায়িত্বশীলও। বইটি পড়ে সকল পাঠকই নিশ্চিত হবেন যে,পরিবেশসম্মত কৃষি প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতর বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই পদ্ধতিই ভবিষ্যতের জন্য গ্রহণযোগ্য পন্থা।

কাজি ফারুক আহম্মদ
নির্বাহী পরিচালক
প্রশিকা

ভূমিকা

প্রকৃতিই জীবজগতকে টিকেয়ে রাখার মূল ভিত্তি। যখন আমি বুঝতে পারলাম কৃষিই এই প্রকৃতিকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে, তখনই কৃষি সম্পর্কে আমার ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। ১৯৮২ সালে আমি যখন ভারতের বিহারে ছিলাম তখনি আমি গ্রষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুর কৃষি সর্ম্পকে প্রথম ধারণা পাই। এর আগে আমি ভাপতাম জৈব পদ্ধতিতে কিভাবে অধিক উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে। আমি ছিলাম একজন কৃষক এবং আমি আমার বাবার খামারে কাজ করতাম। আমার বাবা সেখানে কোনরূপ রাসায়নিক ব্যবহার না করে জৈব কৃষির অনুশীলন করেছিলেন ২০ বছর ধরে। তখন থেকেই কোন ধরনের কৃষি কাজ পরিবেশের উপযোগী এবং পর্যাপ্ত ফসলের নিশ্চয়তা দেয়, সে বিষয়ে আমার ধারনা বদলে যায়।

১৯৮৫ সালে আমি শাপলা নীড়ু এ কাজ করার জন্য বাংলাদেশে আসি (শাপলা নীড় একটি জাপানি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, যেটি গ্রামিন জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য কাজ করে)। এ সময় আমি বাংলাদেশের গ্রামিন জীবনযাত্রা, কৃষি কাজের আনুশীলন ও কৃষকের অবস্থা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি। ১৯৮৮ সালে আমি প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে পরিবেশসম্মত কৃষির উপদেষ্ঠা হিসাবে যোগদান করি। বাংলাদেশের যে অল্প কয়েকটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (ঘএঙ) গ্রামীণ উন্নয়নে পরিবেশকে প্রাধান্য-দেয় এবং দেশব্যাপী বিকল্প কৃষির প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টায় নিবেদিত, প্রশিকা সেগুলোর অন্যতম। তখন থেকে আমি প্রশিকার প্রদর্শনী খামারে পরিবেশসম্মত কৃষির অনুশীলনে নিজেকে নিয়োগ করি এবং এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি।

এই তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ছয় বছরের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কৃষি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমি একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নতুন করে অনুভব করলাম। সেটি হল, যে কৃষি প্রকৃতিকে অনুসরণ করে তা দ্রুত মাটির উর্বরতা ও পরিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং তার ফলে পাওয়া যায় যথেষ্ট ও টেকসই উৎপাদনশীলতা। কিন্তু প্রকৃতিবিরুদ্ধ-কৃষি (রাসায়নিক কষি) দ্রুত পরিবেশের ভারসাম্য ও মাটির গুণাগুণের অবনতি ঘটায় এবং উৎপাদন হ্রাস পায়।

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের তুলনায় গ্রীষ্মমণ্ডলে পরিবেশের ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের ক্রিয়া ও অবনতি খুবই দ্রুত ঘটে। জাপান সহ অন্যান্য নাতিশীতোষ্ণ দেশের কৃষক প্রায় ৫০ বছর আগে রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহার শুরু করে। ৩০ বছর পর এসব রাসায়নিক ব্যবহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও এর সঙ্গে জড়িত ভয়াবহ সমস্যাবলী দেখা দিতে শুরু করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বাংলাদেশের এ সমস্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও সমস্যা দেখা দিয়েছে ১০-১৫ বছরের মধ্যেই। কতিপয় বাংলাদেশী কৃষকের বর্ণনা অনুযায়ী, যে সমস্ত উঁচু জমিতে বন্যার পানি প্রবেশ করে না, সে সমস্ত জায়গায় ৫-৭ বছরের মধ্যেই এ সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে।

এ কারণেই গ্রীষ্মমণ্ডলে পরিবেশসম্মত কৃষির অনুশীলন জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। অন্যথায়, প্রকৃতিবিরুদ্ধ কৃষির জন্যই সুক্ষ্ম-ভারসাম্যযুক্ত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ইকোসিস্টেম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

বইটি লেখার ব্যাপারে আমার মনে দু'টি উদ্দেশ্য কাজ করেছে। প্রথম উদ্দেশ্যটি হচ্ছে একটি সাধারণ ব্যবহারিক পুস্তক রচনা করা, যাতে প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু মূল ধারণার ব্যাখ্যা থাকবে-যা পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষি বলতে কী বোঝায় তা বুঝতে মানুষকে সাহায্য করবে। অন্যটি হচ্ছে গ্রীষ্মমগলীয় বাংলাদেশে পরিবেশসম্মত কৃষি অনুশীলন করতে গিয়ে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা সকলের নিকট পৌছে দেয়া। পাঠক যাতে সহজে বুঝতে পারে যেভাবে বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে `Lessons From Nature` বইটিতে আমি উভয় উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট থেকেছি।

কৃষিকে সঠিকভাবে বুঝতে শুধুমাত্র যে মূল তথ্যগুলির প্রয়োজন, এ বইয়ে তা-ই সন্নিবেশিত হয়েছে। আমি বিশেষ কোন প্রযুক্তি বিশদভাবে আলোচনা করিনি, কারণ আমি বিশ্বাস করি মূল ধারণা বুঝতে পারাটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে কেউ এটি বুঝতে পারলে সে নিজেই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারবে এবং নিজস্ব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারবে। সঠিক মাত্রায় রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের মধ্যেই কৃষিকে সীমিত করে ফেলা সম্ভব নয়। কৃষির সঠিক অনুশীলন আরও জটিল এবং ব্রাপক। কৃষির জন্য তৈরি-করা কোন উত্তর নেই। মূল ধারণা-ভিত্তিক উপযোগিতা-বিচার এবং উদ্ভাবনা কৃষির প্রকৃত উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

পরিবেশসম্মত কৃষিকাজ করার জন্য দুজন মানুষ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। একজন আমার পিতা, যিনি ১৯৭১ সাল থেকে জৈব কৃষির অনুশীলন করে আসছেন। আমি তাঁর সহজ অথচ বলিষ্ঠ ধারণার দ্বারা পরিবেশসন্মত কৃষি কাজে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাঁর কথা- কৃষি হল মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য তৈরি করা; কৃষকের আর্থিক লাভের জন্য বিষাক্ত খাদ্য উৎপাদন করা নয়। তিনি তাঁর কার্যাবলী দ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, রাসায়নিক সার ও বিষ ছাড়াই ভাল ফসল জন্মানো যায়।

“একটি তৃণখন্ডে বিপ্লব” পুস্তকের রচয়িতা, ও একজন প্রাকৃতিক কৃষক মাসানোবু ফুকুয়োকা কৃষি বিষয়ে আমার গুরু । তিনি বলেন প্রকৃতি হল নিখুঁত । মানুষ প্রকৃতির কাজে বিঘ্ন ঘটায় বলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমস্যাগওলি অতিক্রম করার জন্য মানুষ সাধ্যমত কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু তাতে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। কৃষক প্রাকৃতিক বানাঞ্চলে চাষ করেনা কিংবা সার প্রয়োগ করেনা- কিন্তু সেখানকার মাটি নরম ও পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ। প্রতিটি ফসলের জন্য কৃষক জমি চাষ ও সার প্রয়োগ করে কিন্তু কৃষিজমি শক্ত এবং তাতে পুষ্টি উৎপাদন কম। এর কারণ মানুষ প্রকৃতিকে বোঝেনা।

“প্রকৃতিকে তার নিজস্ব নিয়মে চলতে দাও” এইধারণার উপর ভিত্তি করে ফুকুয়োকা প্রকৃতিকে কৃষির একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন, যা “কিছু না করে আবাদ” নামে অভিহিত। চাষ নয়, সার প্রয়োগ নয়, বিষ প্রয়োগ নয়। এ করেই তিনি জাপানের গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশী ধান উৎপাদন করে আসছেন। আমি তার এই সহজ, মৌলিক, গভির চিন্তাপ্রসূত এবং প্রাকৃতির উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তত্ব অনুশীলন দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রানিত হয়েছি।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে। এ সমস্যাগুলি প্রধানত: দু’ধরনের। এক ধরনের সমস্যা শিল্পায়ন ও তথাকথিত আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সৃষ্ট। এর ফলে ঘটে ওজোন স্তরে ক্ষয়, গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া, রাসায়নকি ও পারমানবিক দূষণ ইত্যাদি। অন্যটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ কৃষিকাজ দ্বারা সৃষ্ট। এর ফেল ঘটে মাটি ক্ষয়, বন্যা, খরা, মরুবিস্তৃতি ইত্যাদি।

এ দুটি বিষয়ের কোনতিকভাবে ঘটে না। মানুষই এ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কেবল প্রকৃতিবিরুদ্ধ প্রযুক্তি পরিবর্তন করলেই চলবে না বরং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে । আর তা হলো " প্রকৃতি মানুষের জন্য নয়" বরং "মানুষ প্রকৃতির জন্য"। এক্ষেত্তে প্রযুক্তিগতভাবে এবং ধারণাগতভাবে পরিবেশসম্মত কৃষি একটি জরুরী পদক্ষেপ ।

আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নেয়ার ধারণা । প্রকৃতির মধ্যে থেকে আমাদের সুখী হওয়ার উচিত এবং অনুশীলনের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যে এ ধারণাটি গড়ে ওঠা উচিত ।

"আসুন আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি!"

সিমপেই মুরাকা
মে,১৯৯১
বাংলাদেশ।

প্রথম অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্বপ্রকৃতি এবং কৃষি

আমরা যদি কৃষি, কৃষি সমস্যা ও কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে চাই- তাহলে আমাদের অবশ্যই প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কারণ, এ বিষয়ে প্রকৃতিই আদর্শ। উৎপাদন উর্বরা শক্তি অক্ষুণ্ন রাখা, মাটির ক্ষয় রোধ, রোগ-বালাই নিয়ন্ত্রণ এবং সৌর শক্তি সহ অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রকৃতিই আমাদের সবচেয়ে কর্যকর পদ্ধতি দেখায়। প্রকৃতিকে আমরা তার নিজস্ব রূপ-এ কোথায় পেতে পারি? কৃষি প্রসঙ্গে প্রকৃতিকে তার নিজস্ব রূপে আমরা দেখতে পাই প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল অঢেল জৈব পদার্থ (Boimass) উৎপাদন করে এবং অরণ্যে বসবাসরত সকল প্রাণীর খাদ্য যোগান দেয়। অপরদিকে, কৃষির জন্য কৃত্রিম উপকরণের প্রয়োজন। কৃষির সমস্যা অনেক এবং বনাঞ্চলের তুলনায় উৎপাদন খুবই সামান্য।

“কৃষি এবং অরণ্য” উভয়ের উৎপাদন কৌশল অভিন্ন। উভয় ক্ষেত্রেই উদ্ভিদ, সূর্যালোকের উপস্থিতিতে, তার সবুজ পাতার সাহায্যে, পুষ্টি উপাদান, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পানি ব্যবহারের মাধ্যমে, সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়, শ্বেতসার (বায়োমাস) উৎপাদন করে। পার্থক্যটি হলো- অরণ্য সম্পূর্ণ প্রকৃতিক আর কৃষি অনেকটা কৃত্রিম। এই কৃত্রিমতা কৃষির জন্য বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে, যে

সমস্যাগুলো বনাঞ্চলে একেবারেই নাই। যেমনঃ মাটির উর্বরতা হ্রাস, মাটি ক্ষয়, রোগ-পোকার পাদুর্ভাব- এগুলি কৃষির অসংখ্য সমস্যার কয়েকটি মাত্র এবং এর পরিণতি উৎপাদন হ্রাস।

বর্তমান কৃষির অনেকটা কৃত্রিম হলেও প্রকৃতির অভ্যন্তরেই সম্পন্ন হয় এবং কখনও প্রাকৃতিক সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে না। কৃষির জন্য এই সীমাগুলো অনুধাবন করা এবং সীমানির্দেশিত নিয়মনীতি অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরী। এই নিয়মনীতি সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা থেকেই কৃষির প্রায় প্রায় সকল সমস্যার সৃষ্টি। কৃষির সমস্যা সমাধান করতে চাইলে, কৃষিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও বিশ্লেষণ কারা প্রয়োজন।

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ঃ

১. প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের পরিবেশ-পদ্ধতি (Ecosystem) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতির নিয়মনীতি বুঝবার চেষ্টা

২. প্রকৃতি ও কৃষির মধ্যে পার্থক্য

৩. পানি, কৃষিতে পানির ভূমিকা

৪. উষ্ণমণ্ডলীয় পরিবেশ-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১.১ প্রাকৃতিক অরণ্যের পরিবেশ-পদ্ধতি

অরণ্যের পরিবেশ-পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত। এখানে উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবের বিপুলসংখ্যক প্রজাতি বর্তমান। জীব ও জড়, একে অপরের সহিত সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট ভারসাম্যের পরিবেশে অবস্থান করে। জীব ও জড়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন ও আন্তঃ ক্রিয়াই পরিবেশ-পদ্ধতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং প্রথমেই এ বিষয়ে অবগত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.১.১ পুষ্টিচক্র (পুনঃপ্রাণন পদ্ধতি)

পরিবেশ বিদ্যায়, সকল জীবই উৎপাদনকারী, ভোগকারী ও পচনকারী-এই তিনটি শ্রেণীর যেকোন একটির অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য জড়বস্তুর সঙ্গে উৎপাদনকারী, ভোগকারী ও পচনকারীর পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া সম্পর্কিত ধারণাই পরিবেশ-পদ্ধতি অনুধাবনের মূল বিষয়।

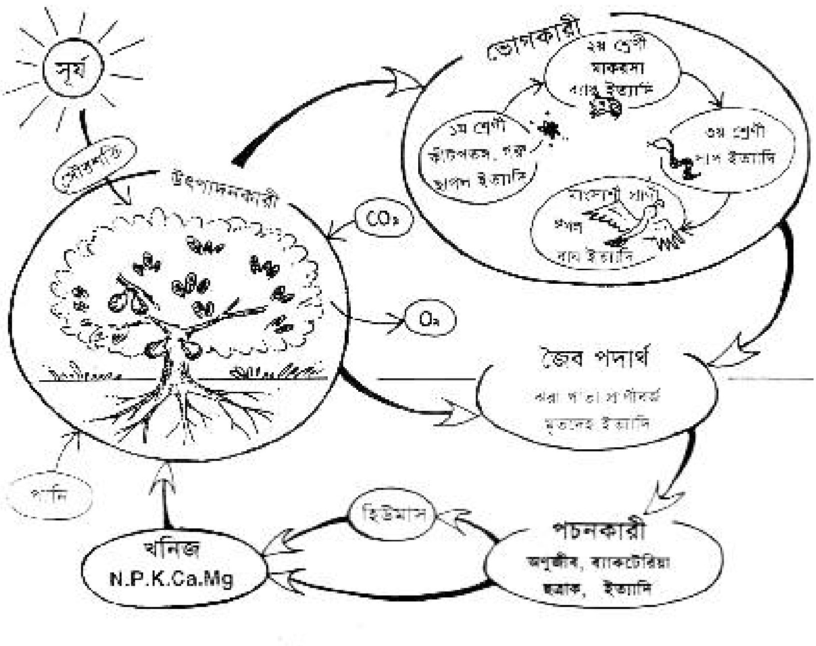

পুষ্টিচক্রের ছবি

উৎপাদনকারী (Producer)

পাতা সবুজ এবং পাতায় ক্লোরোফিল আছে এমন সকল উদ্ভিদ উৎপাদনকারীদের শ্রেণীভুক্ত। পুষ্টি- উৎপাদন ও সৌরশক্তি ব্যবহার করে উৎপাদনকারী নিজের জন্য এবং অন্য সকল প্রাণীর জন্য খাদ্য উৎপাদন করে। উৎপাদনের এই প্রক্রিয়াকে সালোকসংশ্লেষণ বলে।

উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কোন জীব খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না। এই জন্য তাদেরকে 'উৎপাদনকারী' আখ্যায়িত করা হয়।

ভোগকারী (Consumer)

সকল প্রাণী ভোক্তা শ্রেণীভুক্ত। প্রাণীকুল প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের তৈরি খাদ্য (শ্বেতসার) খেয়ে বেঁচে থাকে। সকল ভোগকারী চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত:

- প্রথম শ্রেণির ভোগকারী (তৃণভোজী)
- দ্বিতীয় শ্রেণির ভোগকারী (পতঙ্গভুক)
- তৃতীয় শ্রেণির ভোগকারী (শিকারী জীবজন্তু)
- মাংসাশী প্রাণী।

কীটপতঙ্গসহ সকল তৃণভোজী প্রাণী প্রথম শ্রেণির ভোগকারী। এরা সকলেই উদ্ভিদের পাতা খেয়ে জীবন ধারন করে। পতঙ্গভুক প্রাণীরা দ্বিতীয় শ্রেণির ভোগকারী। এরা সচরাচর প্রথম শ্রেণির ভোগকারীদের খায়। তৃতীয় শ্রেণীর ভোগকারীরা মাংসভোজী প্রাণী। এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভেগকারীদের খায়। সর্বোচ্চ মাংসাশী শ্রেণির ভোগকারীরা শিকারী প্রাণী। এরা তৃতীয় শ্রেণীর ভোগকারীদের খায়। অন্য কোন প্রাণী তাদের জীবন ধারণের জন্য সর্বোচ্চ শ্রেণীর মাংসাশী প্রাণীদের খায় না। এ ভাবেই ভোগকারীদের মধ্যে একটি সুষম সম্পর্ক বিরাজ করে। মানুষও ভোক্তা হিসাবে পরিচিত।

[নোট : প্রাণীদের প্রাকৃতিক সম্পর্ক আরও জটিল। এখানে বর্ণিত শ্রেণিবিন্যাসে শুধুমাত্র মূল বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।]

পচনকারী (Decomposer)

সকল অণুজীবই হলো পচনকারী এবং তারা উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের মৃতদেহ, বর্জ্য ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। মাটিতে বিপুল সংখ্যক অণুজীব বসবাস করে (১ গ্রাম উর্বর মাটিতে ১০ কোটিরও বেশী অণুজীব বসবাস করে)। অণুজীবদের কাজ হল জৈব পদার্থ ভেঙ্গে হিউমাসে রূপান্তরিত করা এবং খনিজ পদার্থের মণিকীভবন ঘটানো। মাটি তৈরী এবং মাটি উন্নয়নের জন্য হিউমাস অপরিহার্য। উদ্ভিদ পুষ্টি-উপাদান হিসাবে খনিজকে পুনরায় গ্রহণ করে। (একটু ভিন্নভাবে দেখলে, অণুজীবেরা প্রকৃতিকে পরিচ্ছন্ন রাখে। এদের জৈবিক কার্যাবলরি ফলেই মাটি পরিচ্ছন্ন থাকে ও উদ্ভিদ জন্মানোর উপযোগী পরিবেশ তৈরী হয়। অন্যথায় সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ উৎপাদনকারী ও ভোগকারীদের বর্জ্যদ্বারা পরিপূর্ণ থাকত)।

চিত্রানুযায়ী, উৎপাদনকারী যত বেশী শ্বেতসার উৎপাদন করবে, তত বেশী ভোগকারী (প্রাণী) বেঁচে থাকতে পারবে। উৎপাদনকারী ও ভোগকারীরা যত বেশী মাত্রায় মাটিতে জৈবপদার্থ সরবরাহ করবে, তত বেশী অণুজীব সক্রিয় হয়ে

উৎপাদনকারীদের জন্য বেশীমাত্রায় পুষ্টি-উপাদান সরবরাহ করবে। উৎপাদনকারীদের বৃদ্ধির সাথে সাথে, শ্বেতসার উৎপাদনের জন্য সৌরশক্তির ব্যবহারও বৃদ্ধি পায়। এই পদ্ধতিটিকে পুষ্টিচক্র বলে। আবার এটাকে কার্বনচক্র, নাইট্রোজেনচক্র, খনিজচক্র ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। বিষয়বস্তুও গুরুত্ব অনুসারে নামকরণের এ পার্থক্য। যখন কার্বনকে লক্ষ্য করে কিংবা কার্বনকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয় তখন এটিকে কার্বনচক্র বলা হয়।

পুষ্টিচক্রকে কেন্দ্র করে সকল জীব বৃদ্ধি পায় এবং মাটি উর্বরতা লাভ করে। প্রকৃতিতে সকল জীব এবং জড় পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল, এখানে কোন কিছুই অপ্রয়োজনীয় নয়। প্রকৃতির সবকিছুই একে অপরের সহিত প্রয়োজনীয়তা ও নির্ভরতার সম্পর্কে গাঁথা। এর কোথাও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে সর্বত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নিদর্শন স্বরূপ, মাটিতে জৈবপদার্থের সরবরাহ বন্ধ করা হলে অণুজীবেরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে, মাটির উর্বরতা হ্রাস পায় এবং অনুর্বর মাটিতে উদ্ভিদ ঠিকমতো বৃদ্ধি পেতে ও উৎপাদন করতে পারে না। কম উৎপাদনের ফলে ভোগকারীদের (প্রাণী) সংখ্যাও কমে যায়।

১.১.২ প্রতিবেশ বিদ্যা সম্পর্কিত পিরামিড

প্রকৃতি যেভাবে প্রত্যেক শ্রেণির ভোক্তাদের সংখ্যাগত পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জীবদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভারসাম্য বজায় রাখে, তা-ই বাস্তব্যবিদ্যা সংক্রান্ত পিরমিডের বিষয়। এখানে পিরামিডের আকার জীবের সংখ্যাগত পরিমাণ নির্দেশ করে (নীচের দিকে বেশী সংখ্যা এবং উপরের দিকে কম সংখ্যা)।

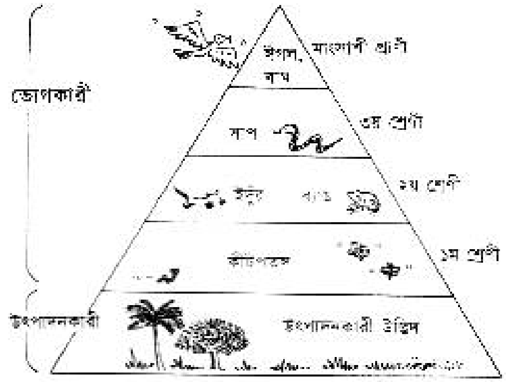

প্রতিবেশ বিদ্যা সংক্রান্ত পিরামিডের ছবি

তথাকথিত ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ প্রথম শ্রেণীর ভোগকারী। এরা সরাসরি উৎপাদনকারীদের অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোক্তারা (পতঙ্গভুক প্রাণী) প্রথম শ্রেণির ভোক্তাদের (কীটপতঙ্গ) খেয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখে, ফলে কীটপতঙ্গের সংখ্যা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে। এতে করে কীটপতঙ্গ সহ প্রথম শ্রেণীর ভোক্তারা কখনও অরণ্যের সকল উদ্ভিদকে খেয়ে সাবাড় করতে পারে না। তৃতীয় শ্রেণীর ভোগকারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোগকারীদের খেয়ে থাকে এবং মাংসাশী প্রাণীরা তৃতীয় শ্রেণীর ভোগকারীদের খেয়ে থাকে। এভাবে নীচের শ্রেণীর ভোগকারীদের দ্বারা খাদ্য সরবারাহ এবং উপরের শ্রেণীর ভোগকারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, প্রকৃতিতে প্রতি শ্রেণীর ভোক্তাদের সংখ্যাগত পরিমাণ সুনির্দিষ্ট থাকে। বাস্তব্যবিদ্যা সংক্রান্ত পিরামিডের গঠন প্রত্যেক শ্রেণির ভোক্তাদের সংখ্যা এবং উৎপাদনকারীদের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং এটা সুস্পষ্ট যে, উৎপাদনকারী উদ্ভিদই এ পিরামিডের মূল ভিত্তি। যদি উৎপাদনকারীরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, শুধুমাত্র তখনই, ভোগকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে; আবার, উৎপাদনকারী উদ্ভিদের সংখ্যা কমে গেলে ভোগকারীদের সংখ্যাও কমে যায়।

উৎপাদনকারী ও ভোগকারীদের মধ্যকার খাওয়া ও খাদ্যে পরিণত হওয়ার এই সম্পর্ককে খাদ্য-শৃঙ্খল বলে। পরিবেশ-পদ্ধতি এই খাদ্য-শৃঙ্খল খুব নিখুঁত ও সুচারুরূপে রক্ষিত থাকে এবং এর যেকোন এক পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সমগ্র পদ্ধতিটি বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয়। উদাহরণ স্বরুপ, ব্যাপকভাবে সাপ নিধন করা হলে ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে যায়। কিংবা পা রপ্তানির জন্য ব্যাপক হারে ব্যাঙ নিধন করা হলে, কীটপতঙ্গের সংখ্যা বেড়ে যায়, ফলে ফসলের উৎপাদন কমে যায়।

১.১.৩ কৃষির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলী:

১. শ্বেতসার (Carbohydrate) তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস সূর্যালোক। কৃষির ক্ষেত্রে সর্বাধিক উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সূর্যালোকের সর্বোচ্চ ব্যবহার।

২. কেবলমাত্র সবুজ সৌরশক্তি ব্যবহার করে শ্বেতসার তৈরী করতে পারে। সবুজ উদ্ভিদের সংখ্যাগত পরিমাণের উপর সৌরশক্তি ব্যবহার মাত্রা নির্ভরশীল।

৩. জৈব পদার্থ মাটির উৎস এবং অণুজীবের আধার। উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে মাটি উন্নয়নের জন্য জৈব পদার্থের সরবরাহ অপরিহার্য।

৪. ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সকল জীব একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতির কোন কিছুই অপ্রয়োজনীয় কিংবা ক্ষতিকর নয়।

১.২ কৃষি ও প্রাকৃতিক অরণ্যের পার্থক্য

১.২.১ বৈচিত্র্য

প্রাকৃতিক অরণ্য ও কৃষির সবচেয়ে বড় পার্থক্য উভয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রজাতির সংখ্যা। প্রাকৃতিক অরণ্যে উদ্ভিদ প্রজাতির ব্যাপক বৈচিত্র্য বিদ্যমান। অরণ্যের প্রতি এক একর জমিতে ১০০টিরও বেশী প্রজাতি পাওয়া যায়। কিন্তু এক একর কৃষি জমিতে কয়েকটি বা মাত্র একটি ফসলের আবাদ করা হয়। কৃষির পরিবেশ পদ্ধতিতে ভারসাম্যহীনতার মূল কারণ একক ফসলের চাষ (monoculture)।

১.২.২ রোগ- পোকাজনিত সমস্যা

অরণ্যে রোগ- পোকাজনিত সমস্যা নেই বললেই চলে। একটি বিশেষ প্রকারের রোগ কিংবা পোকা সমগ্র বন বিনাশ করে ফেলছে এমন ঘটনা কখনও ঘটে না। কৃষির ক্ষেত্রে রোগ-পোকাজনিত সমস্যা গুরুতর। প্রায়শ একটি মাত্র রোগ কিংবা পোকা সমস্ত ফসল বিনাশ করে ফেলে। এর প্রধান কারণ, একক ফসলের আবাদ অর্থাৎ বৈচিত্র্যের অভাব (Lack of diversity)। প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবে কোন রোগ বা পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। কারণ, বিচিত্র উদ্ভিদ প্রজাতির উপস্থিতি এবং নিখুঁত খাদ্য-শৃঙ্খল সর্বদাই কীটপতঙ্গের সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখে। কদাচিৎ কোন পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটলেও তাতে সমগ্র বনাঞ্চল বিনষ্ট হয়না। কারণ, নির্দিষ্ট পোকার খাদ্যাভ্যাস সুনির্দিষ্ট থাকায় মাত্র এক বা একাধিক প্রজাতির গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১.২.৩ মাটির উর্বরা শক্তি

অরণ্যে মাটির উর্বরাশক্তি অক্ষুণ্ন রাখার পদ্ধতি সর্বোত্তম। এখানে মাটির উর্বরতা বজায় রাখার পদ্ধতি ক্রমবর্ধমান এবং মজবুত। অরণ্যে মাটির উর্বরতা কখনও হ্রাস

পায় না। এর কারণ, অরণ্যের নিখুঁত পুষ্টিচক্র এবং বনানী দ্বারা মাটির উপরিভাগ সর্বদা আচ্ছাদিত থাকা। পুষ্টিচক্র মাটির উর্বরাশক্তি বাড়ায়; বনানীর আচ্ছাদন মাটিকে যথাস্থানে সংরক্ষণ করে এবং উর্বরাশক্তি অক্ষুণ্ন রাখে। অন্যদিকে মাটির উর্বরাশক্তি হ্রাস কৃষির অন্যতম প্রধান সমস্যা। উৎপন্ন অধিকাংশ বায়োমান ফসল হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয় বলে কৃষি-জমির পুষ্টিচক্র সর্বদাই বিঘ্নিত হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সামান্যই বায়োমাস জমিতে ফেরৎ দেয়া হয় আর এই সামান্য বায়োমাস জমির উর্বরতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যথেষ্ট নয় বলে (কৃষিজমির) উর্বরতা দিন দিন হ্রাস পায়। আবার মাটির উপরিভাগ উন্মুক্ত থাকায় ভূমি ক্ষয় হয়, যা উর্বরাশক্তি হ্রাসকে আরও ত্বরান্বিত করে।

১.২.৪ বায়োমাস উৎপাদন

অরণ্য বিপুল পরিমাণ বায়োমাস উৎপাদন করতে পারে (যা চিত্রাকারে পুষ্টিচক্রে দেখানো হয়েছে)। কৃষি-জমির তুলনায় অরণ্যের বায়োমাস উৎপাদনের ক্ষমতা দ্বিগুণেরও বেশী। এর কারণ অরণ্যে গাছপালার বহুস্তরবিশিষ্ট গড়ন ও নিখুঁত পুষ্টিচক্র। অরণ্যে গাছপালার বহুস্তরবিশিষ্ট গড়ন প্রাকৃতিক সম্পদের (সূর্যালোক, বৃষ্টির পানি ইত্যাদি) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। পুষ্টিচক্র মাটিকে যথেষ্ট উর্বর করতে সাহায্য করে। কৃষিতে ফসলের বিন্যাস আনুভূমিক হওয়াতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার যথাযথ হয় না। উৎপন্ন সব বায়োমাস ফসল হিসাবে জমির বাইরে চলে যাওয়ায় পুষ্টিচক্র বিঘ্নিত হয় আর এ কারণেই কৃষি জমির উর্বরাশক্তি বছর বছর হ্রাস পায়। সর্বোপরি, কৃত্রিম (বাহ্যিক) উপকরণ ব্যবহার করা সত্ত্বেও কৃষি অরণ্যের তুলনায় কম বায়োমাস উৎপাদন করে-অথচ অরণ্যে কোনরূপ কৃত্রিম উপকরণের প্রয়োজন পড়ে না।

বিভিন্ন ইকোসিস্টেমে বায়োমস উৎপাদন

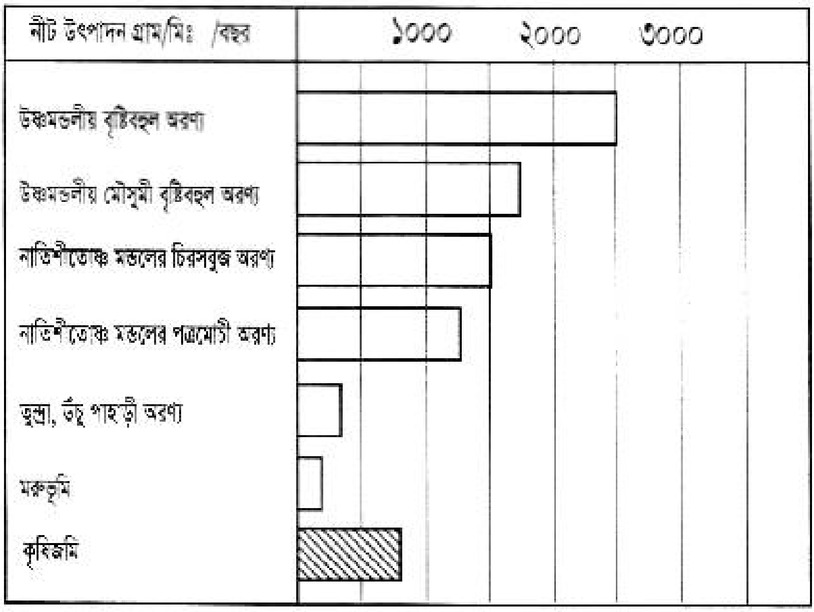

১.৩ পানি

পানি জীবনের জন্য যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয় কৃষির জন্যও তেমন অপরিহার্য। কৃষিকাজে পানির ব্যবহার একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং পানির আবর্তন-ধারা এবং যে সমস্ত বিষয় পানির কার্যকর ব্যবহার বৃদ্ধি করে তা অনুধাবন করা আমাদের সকলের জন্য প্রয়োজনীয়।

১.৩.১ পানির আবর্তন-ধারা

চিত্রের বর্ণনা অনুযায়ী, পানি সৌরশক্তির প্রভাবে পৃথিবীর সর্বত্র আবর্তিত হয়। বনাঞ্চল ও সমুদ্র থেকে বাষ্পীভবনের ফলে মেঘের সৃষ্টি হয়। এই মেঘ উড়ে গিয়ে বৃষ্টি আকারে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। বৃষ্টির পানি স্বল্পকালের জন্য ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করে, এরপর বাষ্পীভবনের মাধ্যমে মেঘে পরিণত হয় কিংবা প্রবাহের মাধ্যমে

নদীতে চলে যায়। উক্ত নদীর পানি পুনরায় সমুদ্রে মেশে এবং মেঘে বৃষ্টি আকারে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে।

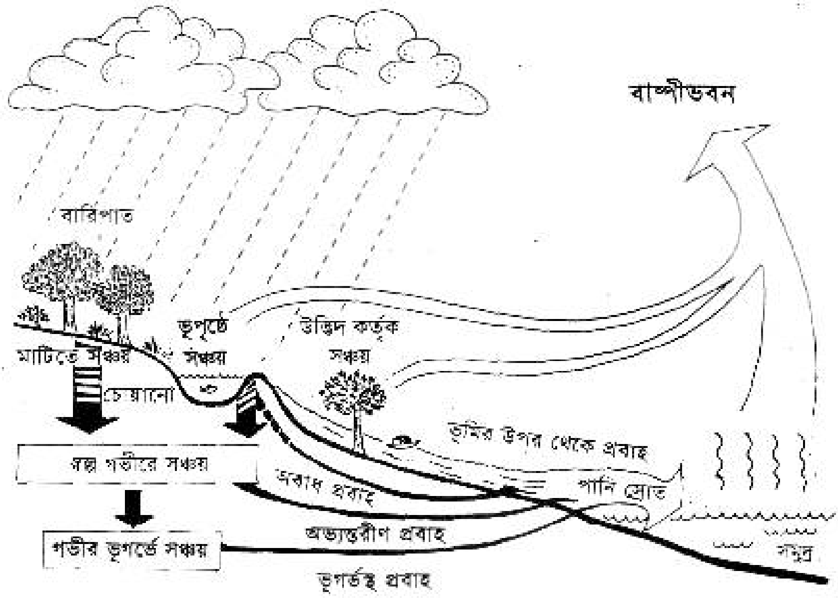

চিত্রেঃ পানির আবর্তন-ধারা

১.৩.২ প্রকৃত বৃষ্টিপাত এবং কার্যকর বৃষ্টিপাত

বৃষ্টিপাত স্থলভাগের পানির উৎস। গাছপালা সমগ্র বৃষ্টির পানির খুব সামান্য অংশ ব্যবহার করে। বাকি অংশ বিভিন্নভাবে অপচয় হয়। ভূপৃষ্ঠে নেমে আসা সবটুকু বৃষ্টির পানিকে প্রকৃত বৃষ্টিপাত বলে। প্রবাহ এবং বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অপচয় বাদে যেটুকু পানি মাটিতে জমা থাকে এবং গাছপালা সহ অপরাপর জীব ব্যবহার করতে পারে সেটুকুই কার্যকর বৃষ্টিপাত। কার্যকর বৃষ্টিপাতই উদ্ভিদ, প্রাণী ও কৃষির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ।

১.৩.৩ বৃষ্টির পানির কার্যকারিতা বাড়ানোর ধ্রুবক (Factors which Increase effective Rainfall)

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, মাটির ধরন, বনানীর নিবিড়তা, ভূমির বন্ধুরতা ইত্যাদির উপর বৃষ্টির পানির কার্যকারিতা বৃদ্ধি নির্ভর করে। জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ মাটি বেশী পানি শোষণ করতে পারে। গাছপালা সরাসরি বৃষ্টির আঘাত থেকে মাটিকে রক্ষা করে এবং মাটিকে ধীরে ধীরে পানি শোষণ করতে সাহায্য করে। উদ্ভিদ দীর্ঘ দিন যাবৎ সেই পানি ব্যবহার করতে পারে। ঢালু জমির তুলনায় ভূমির পানি ধারণাক্ষমতা বেশী।

কৃষির জন্য বৃষ্টির পানির কার্যকারিতা বাড়ানোর উপায়ঃ

১. মাটির পানি-ধারণক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জৈব প্রয়োগ করা

২. পানি ধরে রাখার জন্য স্থায়ী গাছ ও ঘাস লাগানো

৩. মাটিকে বৃষ্টির আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য লতাপতা কিংবা জৈব পদার্থ দ্বারা মাটির উপরিভাগ ঢেকে রাখা

৪ পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার তৈরী করা। শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহারের জন্য এটি খুবই কার্যকরী।

৫ ঢালু জমিতে আনুভূমিক নালা (Terrace) তৈরী করে অথবা কন্টুর পদ্ধতিতে (ঢালু জমির প্রান্তভাগে চাষের বিশেষ পদ্ধতি) আবাদ করে পানির অপচয় কমানো যায়।

উপরোক্ত বিষয়গুলি পরোক্ষভাবে কার্যকর। আসলে কোন এলাকায় অবস্থিত অরণ্যের সংরক্ষণ ও বনায়ন প্রকৃতপক্ষে সেই এলাকায় বৃষ্টির পানির কার্যকরী ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারে। অরণ্য বিপুল পরিমাণ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করতে পারে। এটাই নদীর পানির উৎস। অধিকন্তু, সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত অরণ্য বাষ্প তৈরীর মাধ্যমে মেঘ সুষ্টি করে, যা প্রকৃত বারিপাত বাড়ায়।

১.৪ উষ্ণমণ্ডলীয় ইকোসিস্টেমের বৈশিষ্ট্য

পরিবেশগত বিচারে ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জলবায়ু অঞ্চল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। বাংলাদেশ আর্দ্র উষ্ণ ও অবউষ্ণ জলবায়ু-অঞ্চলে অবস্থিত। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও

ইউরোপীয় দেশসমূহ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণ মণ্ডলীয় ইকোসিস্টেমের তাপমাত্র, বারিপাত, বায়োমাস উৎপাদনের পরিমাণ, গাছপালার ধরন, মাটি এবং আরও অনেক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। কৃষির জন্য উপযোগী নিয়মকানুন পরিবেশগত ধ্রুবকগুলির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। যদি কোন কৃষিপদ্ধতি একটি অঞ্চলের ইকোসিস্টেমের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তাহলে তার উৎপাদনশীলতা টেকসই হয় না বরং সেই অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হয। সুতরাং, কৃষিপদ্ধতি আঞ্চলিক ইকোসিস্টেমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও, উষ্ণমণ্ডলীয় দেশসমূহে এসব নিয়মকানুন সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে কৃষি উন্নয়নের প্রয়াস চালানো হচ্ছে। শিল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে কৌশলগত ধারণা ধার করে এনে কৃষি-উন্নয়ন করা যাবে বলে বর্তমানে বিশ্বাস করা হয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সবুজ বিপ্লবের নামে ‘অধিক খাদ্য ফলাও কর্মসূচী’ শুরু হয়েছে এবং বিগত তিন দশক ধরে তা এদেশে চলছে। উষ্ণমণ্ডলীয় দেশসমূহে পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রচলিত কৃষিপদ্ধতি সবুজ বিপ্লবের ধারণা প্রবর্তনের পর দ্রুত ধ্বংস হয়ে গেছে। তথাকথিত আধুনকি কৃষিপদ্ধতি বা শিল্পোন্নত দেশগুলির কৃষিপদ্ধতি উন্নয়নশীল দেশসমূহে হুবহু এবং ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

১৯৮২ সালে, উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে প্রথম আসার সময় থেকে, আমার মনে একটি জিজ্ঞাসা জন্ম নিয়েছে, “শীতপ্রধান দেশগুলোর তুলনায় উষ্ণমণ্ডলীয় দেশগুলোর কৃষি-উৎপাদন এত কম কেন? উদাহরণস্বরূপ, জাপানে হেক্টর প্রতি ধানের গড় ফলন ৭,০০০ (সাত হাজার) কেজি, অথচ বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি ধানের গড় ফলন মাত্র ২,০০০ (দুই হাজার) কেজি। অন্যান্য ফসলের আনুপাতিক ফলনও কমবেশী একইরূপ। এ প্রশ্নটি আমার কাছে খুবই বড় আকারে দেখা দিয়েছিল। কারণ, বায়োমাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে উষ্ণমণ্ডলীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যের উৎপাদনক্ষমতা সর্বোচ্চ। সমপরিমাণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অরণ্যের তুলনায় উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্য প্রায় দ্বিগুণ বায়োমাস উৎপাদন করে। তাহলে উষ্ণমণ্ডলীয় কৃষির উৎপাদগনের বেলায় এরূপ অসঙ্গতি কেন? এর উত্তর জানতে হলে উষ্ণমণ্ডলীয় আর্দ্র জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য আরও বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

১.৪.১ উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ু

উচ্চ তাপমাত্র ও প্রখর সূর্যালোক

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া অত্যন্ত উষ্ণ। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের তুলনায় গ্রীষ্মমণ্ডলে দিনের পরিধি (Day Length) ও সূর্যোলোকের তীব্রতা বেশী বলে বছরের বেশীরভাগ সময় ধরে গ্রীষ্মমণ্ডলে উচ্চ তাপমাত্রা বিরাজ করে।

সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত

"মৌসুমী প্রবল বৃষ্টিপাত" গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুর এটি চরম বৈশিষ্ট্য। জাপানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫০০ মিলিমিটার। এ পরিমাণ বৃষ্টিপাতের বন্টন মৌসুম-ভিত্তিক নয় বরং সারা বৎসর ব্যাপী। এ দেশে প্রতি সপ্তাহে এক থেকে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এবং তা কখনও প্রবল আকারে নয়। এই কারণে জাপানে প্রবাহের মাধ্যমে বৃষ্টির পানির অপচয় খুবই কম। বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০০০ মিলিমিটার। কিন্তু এ বৃষ্টিপাত শুধু বর্ষা মৌসুমে আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের মৌসুমী বৃষ্টিপাত খুবই প্রবল ও প্রচণ্ড। এই কারণে এদেশের বর্ষা মৌসুমে প্রবাহের মাধ্যমে বৃষ্টির পানির অপচয় খুবই বেশী। বৃষ্টিপাতের সুষম বন্টন না হওয়ার কারণে, বাংলাদেশে বেশী বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও জাপানে বৃষ্টির পানির কার্যকারীতা বেশী।

১.৪.২ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যে পুষ্টি-উপাদানের বন্টন

বনাঞ্চলে পুষ্টি-উপাদান প্রাথমিকভাবে দুটি অবস্থানে জমানো থাকে। একটি জীবিত কলায় (মূল, কাণ্ড, পাতা, শাখা ইত্যাদি)। জীবিত কলা'র শিকড় বাদে বাকী সব অংশের অবস্থান মাটির উপরিভাগে। অন্যটি জৈব পদার্থ (ঝড়া পাতা হিউমাস ইত্যাদি)। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চল ও নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে পুষ্টি-উপাদানের বন্টন ও স্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।

চিত্রের বর্ণনানুযায়ী, নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের অরণ্যে পুষ্টি-উপাদানের স্থিতি (allocation of nutrients) ৫০:৫০ অনুপাতে। অর্থাৎ, মোট পুষ্টি-উপাদানের শতকরা ৫০ ভাগ জীবিত কলায় সঞ্চিত থাকে (মাটির উপর) এবং বাকি অর্ধেক জৈব পদার্থ হিসাবে মাটিতে জমা থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে এই অনুপাত ২০:৮০ থেকে ১০:৯০। অর্থাৎ মোট পুষ্টির শতকরা ৮০-৯০ ভাগ জীবিত কলায়

সঞ্চিত থাকে এবং মাত্র ১০-২০ ভাগ জৈব পদার্থ হিসাবে মাটিতে জমা থাকে। এ দু'টি অঞ্চলে জৈব পদার্থের বিয়োজন এবং হিউমাসের মণিকীভবনের (mineralization of humus) পার্থক্যের জন্য এমনটি হয়ে থাকে।

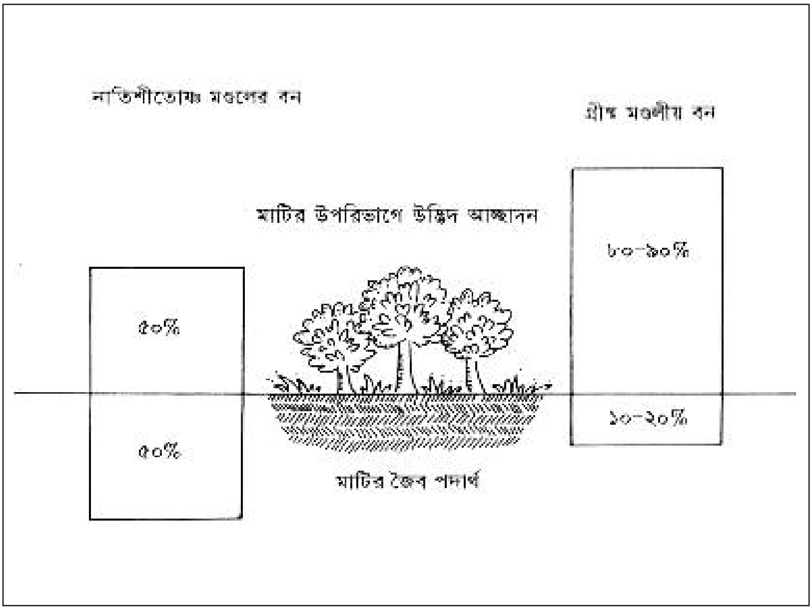

পুষ্টি-উপাদানের বন্টন ও স্থিতি

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুর উচ্চ তাপমাত্র ও উচ্চ আর্দ্রতা, দ্রুত জৈব পদার্থ বিয়োজনের জন্য অনুকূল অবস্থা তৈরী করে। এতে করে দু'টি ঘটনা ঘটে, উদ্ভিদের জন্য খনিজ পদার্থসমূহ দ্রুত গ্রহণোপযোগী হয়; অন্যদিকে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের তুলনায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে জৈব পদার্থের সঞ্চয় কম থাকার কারণে তা দ্রুত নি:শেষ হয়ে যায়।

বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে জৈব পদার্থ বিয়োজনের গতি

অঞ্চল	গড় তাপমাত্রা	বিয়োজন (বছর)	
		অর্ধেক	পূর্ণ
গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্য	২৭.২	২.৮	১১.৯
নাতিশীতোষ্ণ চিরসবুজ বন	১৩.৭	১৩.৯	৬০.৩
হিমমণ্ডলের বন	৫.৬	৩৫.৯	১৫৫.৩

উৎসঃ Ecology & Nature; by T. Kiva-1971

১.৪.৩ অরণ্যের বহুস্তরবিশিষ্ট কাঠামো (Multistory Structure of the Natural Forest)

আমরা দেখেছি, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু চরমাভাবপন্ন এবং এ অঞ্চলের মাটিতে জৈব পদার্থেল পরিমাণ তুলনামূলক কম। এ রকম পরিস্থিতিতে কোন ধরনের কৃষিপদ্ধতি উত্তম? প্রকৃতি তার প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে যে নিখুঁত পদ্ধতিটি দেখায় সেটি হলঃ বনাঞ্চলের বহুস্তরবিশিষ্ট কাঠামো। অরণ্যের এই বহুস্তরবিশিষ্ট কাঠামো জলবায়ুর চরমভাবাপন্নতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এবং সৌরশক্তি সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে।

অরণ্যে কাঠামে

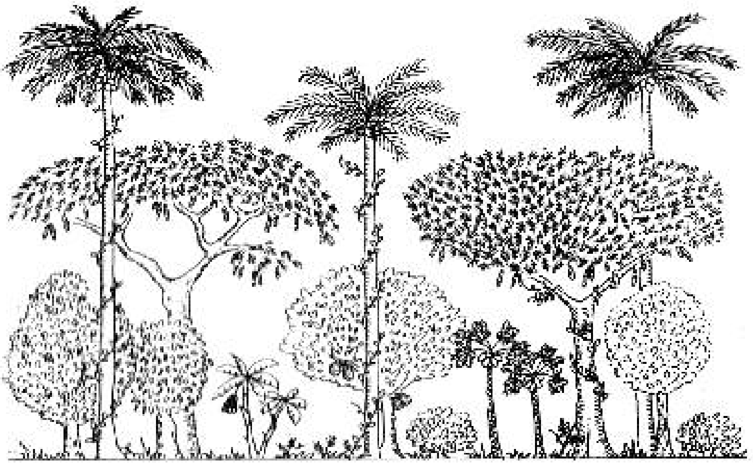

পুষ্টি-উপাদানের বন্টন ও স্থিতি

১. বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাযুক্ত বড় গাছ, যারা সমগ্র অরণ্যকে আচ্ছাদিত করে রাখে

২. বড় গাছের আচ্ছাদনের নীচে মাঝারী ধরনের গাছ

৩. মাঝারী আকৃতির গাছের নীচে ছোট ও ছায়াসহিষ্ণু গাছ

৪. মাটির উপরিভাগে ঘাস ও ঝড়াপাত

অরণ্যে গাছপালার আচ্ছাদন নিবিড় হওয়ার ফলে সূর্যালোক সবুজপাতা ভেদ করে কখনও মাটির সংস্পর্শে আসতে পারে না। প্রবল বৃষ্টিপাত, বড়-মাঝারি- ছোট গাছের পাতা ও ডালপালা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে কখনও সরাসরি ভূপৃষ্ঠে আঘাত করতে পারে না। এতে করে, ঝড়াপাতা সহ অন্যান্য জৈব পদার্থ, মাটি ও গাছের শিকড় সর্বাধিক কার্যকরী মাত্রা পর্যন্ত ধীরে ধীরে বৃষ্টির পানি শোষণ করে নেয়। এভাবে প্রাকৃতিক অরণ্য প্রখর সূর্যালোক ও প্রবল বৃষ্টিপাত যথাযথভাবে ব্যবহার করে।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য সর্বাধিক মাত্রায় বায়োমাস উৎপাদন করতে পারে। এর কারণ অরণ্যের ইকোসিস্টেমে সৌরশক্তি ও পানির সর্বাধিক ব্যবহার হয় এবং উদ্ভিদের জন্য খনিজ সরবরাহ করতে জৈব পদার্থের দ্রুত বিয়োজন হয়।

১৪.৪ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ইকোসিস্টেমে কৃষির সমস্যা (Problems of Agriculture in the Tropical Ecosystem)

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চরমভাবাপন্ন জলবায়ু এবং জৈব পদার্থের দ্রুত পচনক্রিয়া অরণ্যে বায়োমাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেরূপ সহায়ক ভূমিকা পালন করে, কৃষির ক্ষেত্রে সেরূপ ঘটেনা। অরণ্যের গাছপালা কেটে সে স্থানে প্রচলিত রীতিগত কৃষিকাজের সুচনা করা হয়। গাছপালা কেটে সে স্থানে প্রচলিত রীতিগত কৃষিকাজের সূচনা করা হয়। গাছপালা কেটে সরিয়ে ফেলার ফলে মাটি থেকে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ পুষ্টি উপাদান বাইরে চলে যায় এবং যে মাটিতে কৃষিকাজ সূচীত হয়, সে মাটিতে কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট জৈব পদার্থ না থাকায়, তা অনুর্বর হয়ে পড়ে। সেই মাটিতে আগের তুলনায় পানি-ধারণক্ষমতা কমে যায় এবং কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিতেও ঘাটতি দেখা যায়। এছাড়া, প্রখর সূর্যালোক সরাসরি মাটির সংস্পর্শে আসে বলে মাটি গঠনে অবক্ষয় ঘটে ও মাটি শক্ত হয়ে

যায়। এমতাবস্থায় প্রবল বৃষ্টিপাত মাটিকে সরাসরি আঘাত করে এবং নগ্ন মাটির উপরিভাগ বেশী পানি ধারণ করতে পারে না বলে প্রবাহের মাধ্যমে মাটির ক্ষয় হয়। প্রখর সূর্যালোক ও প্রবল বৃষ্টিপাতের মতন প্রাকৃতিক সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহৃত না হওয়ায়, এগুলি তখন ভূমিক্ষয়, বন্যা, খরা সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ হিসাবে দেখা দেয়।

ভূমিক্ষয়

সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতি বছর ৭৫০০০ মিলিয়ন টন মাটি ক্ষয় হয়। এই পরিমাণ মাটি মাথাপিছু ১৫ টনের সমতুল্য।

ভূমিক্ষয়ের ফলে প্রতিবছর ২৭ মিলিয়ন একর কৃষি-জমি বিলীন হয়ে যায়-যা বাংলাদেশের মোট কৃষি-জমির (২০ মিলিয়ন একর) চেয়ে বেশী।

ভূমিক্ষয়ের হার

প্রতি একর কৃষি-জমি থেকে বছরে ২০ টন
প্রতি একর প্রাকৃতিক অরণ্য থেকে বছরে ০.০৪ টন।

উৎসঃ *FAR from Paradise; by John Seymour & Hervert Girardet.*

১.৪.৫ উপসংহার

আমরা দেখেছি, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ইকোসিস্টেমের বৈশিষ্ট্য চরমভাবাপন্ন কিন্তু এর ভাসাম্য অত্যন্ত নিখুঁত। সমগ্র এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটিয়ে বর্তমানে এমন একটি কৃষিপদ্ধতি গড়ে তোলা প্রয়োজন, যা প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করতে সক্ষম হবে। এ কাজটি কখনও তথাকথিত আধুনিক কৃষির অনুকরণের দ্বারা সম্ভব নয়। আমরা যদি গ্রীষ্মমণ্ডলের জন্য উপযোগী একটি কৃষিপদ্ধতি উদ্ভাবনে সফল হই তবে তা নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের অনুসৃত তথাকথিত আধুনিক কৃষির তুলনায় বেশী উৎপাদনশীল হবে। প্রকৃতি আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বারোমাসে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের চেয়ে গ্রীষ্মমণ্ডল বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন।

কৃষিকাজ কৃত্রিম হলেও প্রকৃতির নিয়ম-নীতির অধীন। কৃষিকাজ কখনও প্রকৃতির নিয়মের বাইরে সম্ভব নয়। মানব জাতির ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বহু সভ্যতার পতনের কারণ ঐ সকল জাতি প্রকৃতির সহযোগিতা না করে বরং বিরোধিতা করেছিল। "সভ্যতা অরণ্য অতিক্রম করে পিছনে মরুভূমি ফেলে যায়!" এমন ঘটনা অতীতেও ঘটেছে বর্তমানেও ঘটেছে। বন উজার হওয়ার ফলে সৃষ্ট মরুময়তা বর্তমানে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহের জন্য সবচেয়ে জটিল পরিবেশগত সমস্যা। পরিবেশবিধ্বংসী ও অনুপযোগী কৃষিকাজের অনুশীলনই এর মূল কারণ। আমাদের এটা বোঝা উচিত যে, ত্রুটিপূর্ণ কৃষিপদ্ধতি পরিবেশের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়, যেখানে আমাদেরও অস্তিত্ব নিহিত। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ইকোসিস্টেমে এটা অতি সহজেই ঘটে থাকে।

"জীবন্ত প্রকৃতিতে এমন কিছুই ঘটেনা যা সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাটি

মাটি কৃষির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। যে সকল চাষী রাসায়নিক কৃষির অনুশীলন করে, তারা সর্বদাই মাটিকে শুধুমাত্র উদ্ভিদের অবলম্বন এবং পানি ও খনিজের ধারক হিসাবে বিবেচনা করে। কিন্তু "মাটি" এত সহজে বুঝতে পারার মতন বস্তু নয়। মাটি সম্পর্কে এ ধরনের ভুল ধারণার কারণেই, বছর বছর মাটির ক্ষমতা নি:শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়:

১. "মাটি" শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী

২. মাটির কাজ এবং বৈশিষ্ট্য

২.১ মাটি কী?

ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র আমরা মাটি দেখতে পাই। কিন্তু জীবের আবির্ভাবের আগে পৃথিবীর কোথাও কোন মাটির অস্তিত্ব ছিল না। জীবের আবির্ভাবের পর পরই মাটি তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

কিভাবে মাটি তৈরী হল? যখন উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ থেকে প্রাপ্ত জৈবপদার্থ, বিচুর্ণ পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত হল, ঠিক তখন থেকে খনিজ (Powder of rock) জৈবপদার্থ, পানি, বাতাস ইত্যাদি মধ্যে জৈবিক কর্মকাণ্ড ও রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হল এবং অণূজৈবিক কর্মকাণ্ডের ফলে হিউমাস তৈরী শুরু হল। এভাবেই মাটি তৈরী হয়েছে। সাধারণ কথায় মাটি হল খনিজ, হিউমাস, পানি ও বাতাসের মিশ্রণ।

হাজার হাজার বছর পুষ্টিপ্রবাহের ফলে মাটি তৈরী হয়ে ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হয়েছে। মাটির এই অংশকে “টপ সয়েল” (Top Soil) বলে। উপরিস্তরের এই মাটি জৈবপদার্থ সর্মদ্ধ এবং মাটির উপরিভাগের উপর কৃষি নির্ভরশীল। ভূপৃষ্ঠের যেখানে মাটি নাই সেখানে কৃষির অনুশীলনও নাই।

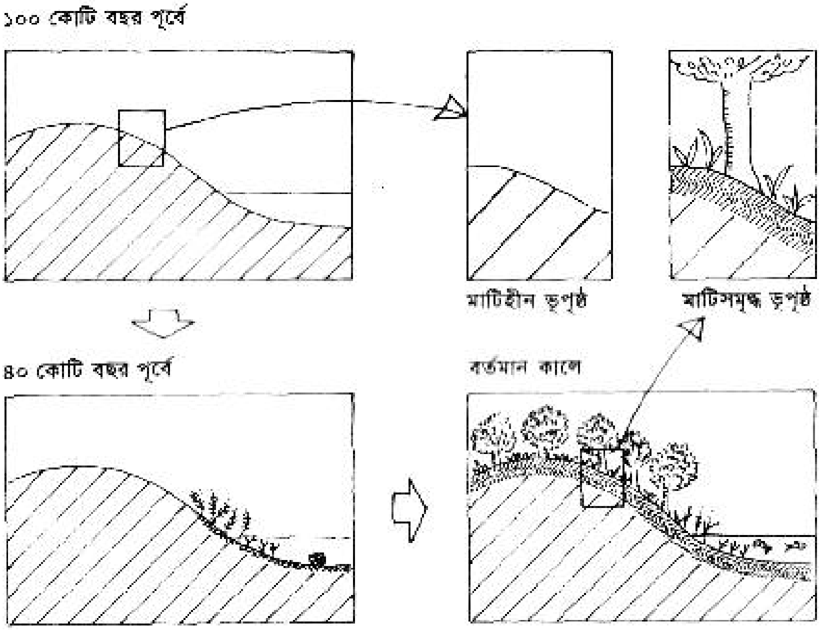

মাটি তৈরীর কথা

২.২. মাটির কাজ ও গুণাবলী

কৃষিতে মাটির কাজ হল উদ্ভিদকে অবলম্বন দেয়া, উদ্ভিদের জন্য পুষ্টি-উপাদান, পানি, বাতাস ইত্যাদি ধারণ করে সরবরাহ করা এবং উদ্ভিদ জন্মানোর উপযোগী অবস্থা তৈরী করা। উৎকৃষ্ট মাটিতে এই তিনটি গুণ সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। কোন ধরনের মাটি উৎকৃষ্ট (অর্থাৎ কোন ধরনের মাটিতে এই তিনটি গুণ বিদ্যমান)? কৃষকদের ধারণায়, কালচে বর্ণের, নরম/ঝুরঝুরে এবং কেঁচো সহ অন্যান্য অনুজীবে

সমৃদ্ধ মাটিই উৎকৃষ্ট। উক্ত কথাগুলোই বিজ্ঞানের পরিভাষায় এরূপ; উৎকৃষ্ট বুনট, পর্যাপ্ত পানি ধারণাক্ষমতাসম্পন্ন, পুষ্টি-উপাদানে সমৃদ্ধ এবং অণুজৈবিক কর্মকাণ্ডে সমৃদ্ধ মাটি উৎকৃষ্ট।

উৎকৃষ্ট মাটির গুণাবলীকে ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এ তিনটি গুণে গুণান্বিত ও সমৃদ্ব মাটি আসলেই উৎকৃষ্ট।

২.২.১. যথোপযুক্ত ভৌত গুণাবলী

মাটির পানি-ধারণক্ষমতা পরিমিত হতে হবে, নিকাশ-ব্যবস্থাও ভাল হতে হবে। যে মাটিতে ভৌত গুণে সমৃদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয় সে মাটির পানি ধারণক্ষমতাও নিকাশ ব্যবস্থা উত্তম।

মাটি মূলত: খনিজ হিউমাস, পানি ও বাতাসের সমন্বয়ে গঠিত। মাটির গঠন ভাল কি মন্দ তা মাটিতে বিদ্যমান উক্ত উপাদানগুলির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। মাটিতে তুলনামূলকভাবে খনিজের পরিমাণ বেশী হলে মাটি শক্ত হয়ে যায়। উদ্ভিদের শিকড় প্রবেশের জন্য মাটি যথেষ্ট নরম হওয়া উচিত। মাটিতে পানির পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে বাতাসের পরিমাণ কমে যায়। ফলে, গাছের শিকর ও অন্যান্য অণুজীবের জন্য অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। মাটিতে বাতাসের আধিক্যে পানির অভাব দেখা দেয়। ফলে, উদ্ভিদ মাটি থেকে স্বাভাবিকভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং, খনিজ,পানি, বাতাস ও জৈব পদার্থের সুষম উপস্থিতি মাটির চাষোপযোগিতা নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

একটি স্থানের মাটি কোন প্রকৃতির তা মাটিতে বিদ্যমান উক্ত উপাদানগুলির পরিমাণের উপর নির্ভশীল। কাদা মাটিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ বেশী এবং পানিধারণক্ষমতা উত্তম; কিন্তু এ মাটিতে বাতাসের সরবরাহ কম। বেলে মাটির বায়ুধারণক্ষমতা বেশী, কিন্তু পানিধারণক্ষমতা কম। কাদা ও বালুর পার্থক্য হল এদের কণাগুলোর আকার ও কণাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান রন্ধ্র-পরিসর (pore space)। সম পরিমাণ বাতাস ও পানি ধরে রাখতে সক্ষম, এমন রন্ধ্র-পরিসরের মাটিই উত্তম। কাদা কণার আকার ক্ষুদ্র এবং রন্ধ্র-পরিসরও কম। কাদা মাটিতে পানি দিলে, রন্ধ্র-পরিসর পানি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় এবং বাতাস বের করে দেয়।

সুগঠিত
মাটিতে সচরাচন
৩৫% খনিজ
৫% জৈব পদার্থ
৩০% পানি ও
৩০% বাতাস থাকে।

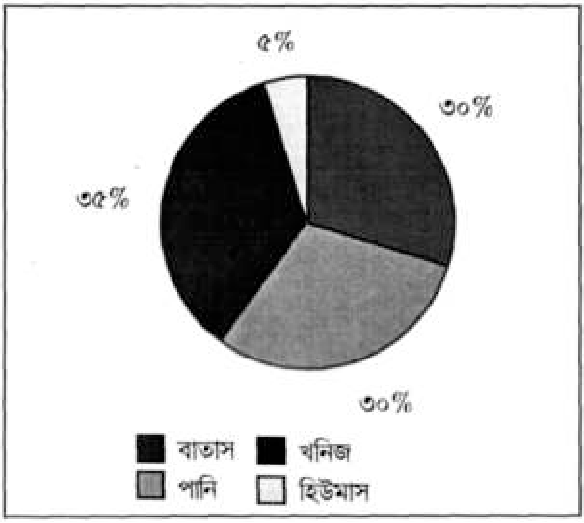

মাটির গঠন

বালুকণা বড় এবংবালুর রন্ধ্র-পরিসরও বেশী। বালুর ভিতর পানি দিলে চুঁইয়ে যায় এবং পুনরায় বাতাস রন্ধ্র-পরিসর পূর্ণ করে ফেলে। সুতরাং, কর্দম ও বালু মিশ্রিত মাটিই কৃষির জন্য উত্তম।

মাটির বুনট এক হওয়া সত্ত্বেও কোন মাটি চাষোপযোগী আবার কোন মাটি চাষের অনুপযোগী হতে পারে। এর কারণ মাটিতে হিউমারেস পরিমাণ। হিউমাসে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যই যে-মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ যত বেশী, সে মাটি তত বেশী সুগঠিত (কৃষি কাজের উপযোগী)। প্রথমত; হিউমাস অরেকটা পেস্ট এর মতন, যা কাদার কণাকে একত্রিত করে খুব ছোট পিণ্ডের আকৃতি দান কের। এই পিণ্ডের আকার ও রন্ধ্র-পরিসর কৃষির জন্য উত্তম। দ্বিতীয়ত: হিউমাসের পানি- ধারণক্ষমতা উত্তম। হিউমাসের এই বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য, মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ হিউমাসের সরবরাহ নিশ্চিত করা গেল, কাদা মাটির পানি-নিষ্কাশনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বেলে মাটির পানিধারণক্ষমতা বাড়ে। এটা মনে রাখা প্রয়োজন, একমাত্র হিউমাস কার্যকরীভাবে মাটির গঠন উন্নত করে।

পুষ্টিচক্রে আমারা দেখেছি, অণুজীব জৈব পদার্থ বিয়োজন করে হিউমাসে রূপান্তর ঘটায় যা মণিকীভবন প্রক্রিয়ায় (Mineralization) নিঃশেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ হিউমাস চিরকাল মাটিতে থেকে যায় না। সুতরাং, মাটিতে জৈব পদার্থের সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হলে মাটির গঠনের অবনতি ঘটে। রাসায়নিক সার কখনও মাটির গঠন উন্নত করে না বরং অণুজীবদের মেরে ফেলে ও মণিকীভবন ত্বরান্বিত করে ফলে মাটির গঠন ধ্বংস হয়ে যায়। মাটিতে জৈব পদার্থের যোগান না দিয়ে, রসায়নিক সারের উপর অধিক নির্ভশীলতার কারণেই বাংলাদেশের মাটির গুণ দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

২.২.২. উপযোগী রাসায়নিক গুণাবলী

মাটিতে সংঘঠিত রাসায়নিক কর্মকাণ্ড দ্বারা রাসায়নিক গুণাবলী নির্ধারিত হয়। যে মাটির আম্লমান পরিমিত (Optimum PH) এবং ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা (CEC) উচ্চ সে মাটি রাসায়নিক গুণে সমৃদ্ধ।

মাটির পুষ্টির পুষ্টি-উপাদান ধরে রাখার ক্ষমতা (CEC)

খনিজ পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত হলে রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা ধনাত্মক আয়ন ও ঋণাত্মক আয়নে বিভক্ত হয়ে যায়। ফসফরাসের মতন কয়েকটি খনিজ ব্যকিরেকে, অধিক উদ্ভিদ-পুষ্টি-উপাদান মৃত্তিকা দ্রববণে ধনাত্মক আয়ন রূপেই থাকে। গাছের শিকড় ঐ সকল খাদ্যোপাদান আয়ন বিনিময়ের মাধ্যমে গ্রহণ করে। মৃত্তিকা বিজ্ঞানীগণ মাটির ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা মাত্রাকে মাটির পুষ্টি-উপাদান ধরে রাখার ক্ষমতা হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন।

মাটির ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা কত বেশী বা কম তা ঐ মাটিতে বিদ্যমান কোলয়েডের পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। উত্তম কোলয়েড অধিক ধনাত্মক আয়ন ধরে রাখতে পারে যা খারাপ কোলয়েড পারে না। হিউমাসও কাদা মাটিতে কোলয়েড সরবরাহ করে। বালুর দ্রবণে কোন কোলয়েড গুণ নাই। সুতরাং নিরেট বালুর পুষ্টি-উপাদান ধরে রাখার ক্ষমতা নগণ্য এবং কাদার উত্তম। হিউমাস থেকে উত্তম কোলয়েড পাওয়া যায়। মাটির পুষ্টি-উপাদান ধরে রাখার ক্ষমতা কত

বেশী বা কম তা হিউমাস কোলয়েড দ্বারা নির্ধারিত হয়। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কমে গেলে, মাটির পুষ্টি-উপাদান ধরে রাখার ক্ষমতাও কমে যায়।

পুষ্টি-উপাদান ধারণের ক্ষমতা - CEC

বিষয়বস্তু	এম,ই/১০০ গ্রাম
হিউমাস	৬০০
উত্তম কাদার কণা (মন্টমবিলোনাইট)	৮০-১৫০
নিম্নমানের কাদার কণা (কেওলিনাইট)	৩-১৫
বালু	০
ভাল মাটি	২০-এর বেশী
খারাপ মাটি	৫-এর কম

উৎসঃ Ecology & Nature; by T. Kiva-1971

রাসায়নিক সার ব্যবহারকারী সব চাষীর অভিযোগ "বছর বছর সারের মাত্রা না বাড়ালে একই মাত্রায় উৎপাদন বজায় থাকে না"। এ সমস্যাটির কারণ হল রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটির পুষ্টি-উপাদান ধরে রাখার ক্ষমতা হ্রাস পায়। মাটির উর্বরতা বিধানের জন্য রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা এবং মাটিতে জৈব পদার্থ সরবরাহ না করার ফলে হিউমাস এবং হিউমাস কোলয়েডের উৎকর্ষ হ্রাস পূরণ করার জন্য কৃষকদের অধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। রাসায়নিক সার শুধুমাত্র কয়েকটি প্রধান উপাদানের গ্রহণোপযোগিতা বাড়ায়, কিন্তু কখনও ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে না।

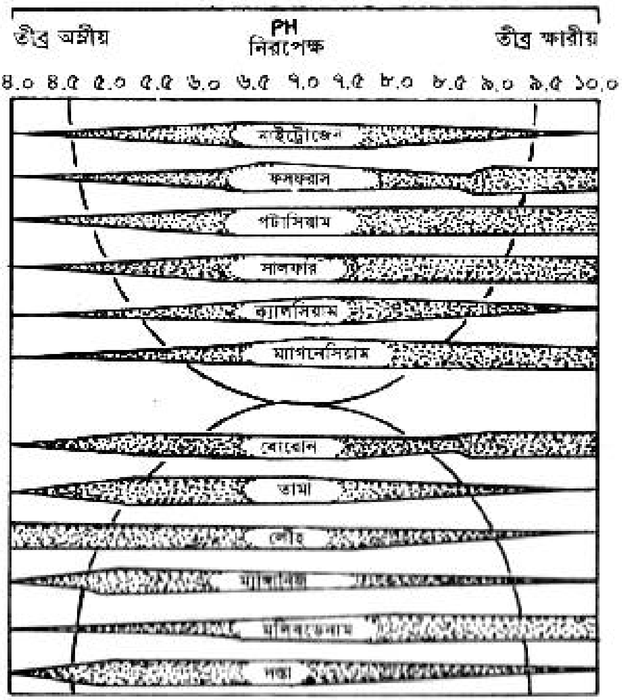

খনিজের সহজলভ্যতায় pH এর প্রভাব

মাটির pH

কোন মাটি অম্লীয়, নিরপেক্ষ কিংবা ক্ষারকীয় গুণসম্পন্ন কিনা তা নির্দেশ করতে pH ব্যবহার করা হয়। এবং ১ থেকে ১৪ এই সংখ্যাগুলো দ্বারা তা প্রকাশ করা হয়। এখানে pH =৭ নিরপেক্ষ মাত্রা নির্দেশক। ৭-এর চেয়ে ছোট সংখ্যা অম্লীয় এবং বড় সংখ্যা ক্ষরকীয় মাত্রা নির্দেশ করে। অতিরিক্ত অম্লীয় কিংবা ক্ষরকীয় মাটিতে উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না এবং এরূপ মাটি থেকে উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণও করতে পারে না। অধিকাংশ উদ্ভিদের জন্য উপযোগী pH মাত্রা হল ৫.৫-৭.৫ এই সীমার মধ্যে। সুতরাং pH-এর মান ৭-এর কাছাকাছি রাখা কৃষি কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাটির pH নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিউমাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিউমাস নিজে নিরপেক্ষ এবং অম্লত্ব বা ক্ষরত্ব নিয়ন্ত্রণে রেখে নিরপেক্ষ মাত্রার কাছাকাছি সমন্বয় করতে পারে। রাসায়নিক সার অম্লীত্ব গুণসম্পন্ন হওয়ায় ইহা ব্যবহারে মাটির অম্লত্ব

বৃদ্ধি পায়। মাটির অম্লত প্রশমনে রাসায়নিক সারের কোন কার্যকর ক্ষমতা নাই। বিজ্ঞানীগন মাটির অম্লাত্ব প্রশমন করতে ক্যালসিয়াম ব্যবহারের সুপারিশ করে থাকেন। মাটির অম্লত্ব দুর করতে এটি একটি সাময়িক ব্যবস্থা এবং ইহা অন্য অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। (সেকশান ৩.৩.১)

২.২.৩ উপযোগী জৈব গুণাবলী

ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক ও কেঁচো সহ মাটিতে বসবাসকারী অন্যান্য জীব ও জীবাণুর কার্যাবলীই মাটির জৈবিক বৈশিষ্ট্য। মাটিতে বিপুলসংখ্যক অণুজীব বাস করে (প্রতি এক গ্রাম উর্বর মাটিতে দশ কোটিরও বেশী)। কোন মাটি জৈব গুণে কতখানি সমৃদ্ধ তা ঐ মাটিতে বসবাসরত অনুজৈবিক কর্মকান্ড ও সুষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

বিয়োজন ও মণিকীভবন

পুষ্টিচক্র কার্যকর রাখার ক্ষেত্রে অণুজীবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মাটি সৃজন, জৈব পদার্থের বিয়োজনের মাধ্যমে হিউমাস তৈরী এবং হিউমাসের মণিকীভবনের মাধ্যমে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী পুষ্টি-উপাদান সরবরাহের যাবতয়ি কাজ অনুজৈবিক কর্মকান্ডের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। জৈব পদার্থের বিয়োজন এবং মণিকীভবন প্রক্রিয়া মাটি এবং উদ্ভিদ উভয়ের জন্যই অপরিহার্য।

অনুজীব যত বেশী সক্রিয়ভাবে কাজ করবে, মাটিতে উদ্ভিদের জন্য গ্রহণোপযোগী হিউমাস এবং পুষ্টি-উপাদানও তত বেশী বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং মাটিকে ভৌত ও রাসায়নিক গুণে সমৃদ্ধ করতে হলে, মাটিতে জৈব পদার্থের যোগান নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। কারণ জৈব পদার্থ মাটিস্থ অণুজীবের খাদ্য। কিন্তু আজকাল চাষীরা রাসায়নিক সার ব্যবহার করার কারণে মাটিতে জৈব পদার্থ সরবরাহের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করে না।

মাটির স্বাস্থ্য

মাটির অভ্যন্তরীণ পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রেও অণুজীবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কতক অণুজীব উদ্ভিদ-রোগের কারণ হলেও, নিরীহ এবং উপকারী অণুজীবদের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা না দিলে ক্ষতিকর অণুজীবদের

সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকে; তখন এরা উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ, মাটিতে দুই লক্ষেরও বেশী প্রকারের নিমাটোড আছে। এদের মধ্যে মাত্রা দুই শতাংশ উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি করে। বাকী ৯৮ শতাংশ উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এই ৯৮ শতাংশ নিমাটোড ক্ষতিকর নিমাটোডের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে। কতক ছত্রাক ক্ষতিকর নিমাটোডদের খায়। যে মাটিতে অণুজীবদের মধ্যে ভারসাম্য বিরাজমান সেখানে উদ্ভিদের জন্য নিমাটোড কোন সমস্যা নয়। উদ্ভিদ রোগসমূহের প্রায় নব্বই শতাংশ ছত্রাক দ্বারা ঘটে থাকে। আবার ছত্রাক দ্বারা ঔষধও প্রস্তুত হয়ে থাকে। অণুজৈবিক ভারসাম্যপূর্ণ মাটিতে ছত্রাকের সংখ্যা ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যার তুলনায় কম। ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের মধ্যে সংখ্যাগত দিক দিয়ে উচ্চ অনুপাত বিরাজ করায় এমনটি হয়ে থাকে।

মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ উত্তম জৈব পদার্থ প্রয়োগ করলে অণুজীবদের মধ্যকার ভারসাম্য বজায় থাকে এবং ক্ষতিকর রোগজিবাণু দূরীভূত হয়। রাসায়নিক কৃষির অনুশীলন মাটিতে জৈব পদার্থের সরবরাহ না করে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ ফসল উৎপাদনপদ্ধতির চর্চা করে বলে মাটিতে বসবাসকারী অণুজীবদের মধ্যকার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসায়নিক কৃষি অনুশীলনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলী

বাংলাদেশে সবুজ বিপ্লবের নামে রাসায়নিক কৃষির ধারণা ও কলাকৌশল প্রবর্তিত হওয়ার পর মনে হয়েছে প্রধান ফসল, বিশেষ করে ধান-এর উৎপাদন বেড়েছে। সে যাই হোক, গ্রামীণ এলাকায় রাসায়নিক কৃষি বিরূপ প্রভাব ফেলেছে, যা গ্রামীণ কৃষক ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

রাসায়নিক কৃষি শুধুমাত্র আর্থিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে। এই কৃষিপদ্ধতি সামাজিক কিংবা পরিবেশগত দিক মোটেই বিবেচনা করে না। পরিবেশগত দিক বিবেচনায় এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং ধ্বংসাত্মক। এই কৃষি প্রযুক্তি বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

কীটনাশক ছত্রাকনাশক ইত্যাদির মতন রাসায়নিক বিষ ব্যবহারের ফলে সৃষ্টি সমস্যাগুলোর মধ্যে কয়েকটি হল: মাটির গুণগত মানের অবনতি, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, রোগ পোকা জনিত সমস্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সমস্যা, পরিবেশ দূষণ, খাদ্যের গুণগত মান লোপ ইত্যাদি। বর্তমানে কৃষক ও অন্যান্য সকলে এই সমস্যাগুলোর ব্যপকতা অনুভব করতে শুরু করেছে।

এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়:

১. রাসায়নিক কৃষি অনুশীলনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলী

⇒ পরিবেশগত

⇒ আর্থিক

⇒ সামাজিক

২. কিভাবে এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হল

৩.১ পরিবেশগত সমস্যা

যখন কৃষকগণ রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহার শুরু করেছেন, তখন থেকেই তাঁরা ক্রমাগত অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমরা পর্যায়ক্রমে সে সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করব।

৩.১.১ মাটির গুণগত মানের অবনতি

রাসায়নিক কৃষি অনুশীলন করে কৃষকগণ সর্বপ্রথম যে সমস্যাটির মুখোমুখী হয়েছেন, সেটি হ'ল মাটির গুণগত মানের অবনতি। এর একটি কারণ মাটিতে জৈব পদার্থ সরবরাহ না করা। ক্রমান্বয়ে মাটিতে হিউমাস হ্রাস পাওয়ার ফলে একের পর এক যে সমস্যাগুলোর উদ্ভব হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

১. মাটির গঠনে সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দেয় ও মাটি শক্ত হয়ে যায়

২. মাটির পানি-ধারণক্ষমতা হ্রাস পায়

৩. পুষ্টি-উপাদান ধরে রাখার ক্ষমতা হ্রাস পায়

৪. অণু-পুষ্টি-উপাদানের ঘাটতি দেখা দেয়।

৫. অণুজীবদের সংখ্যা কমে যায় এবং তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

অন্য কারণটি হ'ল রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহারের ফলেও অণুজীবেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্বের আলোচনা মোতাবেক, যে মাটি ভৌত গুণে সমৃদ্ধ, রাসায়নিক গুণে সুসমঞ্জস এবং জৈব গুণে সমৃদ্ধ ও সক্রিয় সেই মাটিই উত্তম। রাসায়নিক কৃষি

অনুশীলনের মাটিতে শুধুমাত্র কতক প্রধান পুষ্টি-উপাদানের (ঘ.চ.ক যা রাসায়নিক গুণাবলীর অংশ) গ্রহণোপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সার্বিক বিচারে এই কৃষিপদ্ধতি মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুণাবলীর অবনতি ঘটায়। মাটিতে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে যা ঘটে, তা হলঃ

১) pH ভারসাম্য হারায়, ফলে মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়

২) হিউমাস নিঃশেষ হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়

৩) বিষক্রিয়ায় অণুজীব মারা যায়, ফলে মাটির অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে

উদ্ভুত সমস্যাগুলো সমাধান করতে, একই রাসায়নিক পদার্থ বেশী পরিমাণে ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। এটি একটি অস্থায়ী সমাধান প্রক্রিয়া। এর ফলে আবার নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় এবং মাটির গুণগত মানের অবনতি ত্বরান্বিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ-মাটির অম্লত্ব দূরীকরণের জন্য রাসায়নিক কৃষি-প্রযুক্তি ক্যালসিয়াম ব্যবহারের সুপারিশ করে। ক্যালসিয়াম ব্যবহারের ফলে অম্লত্ব ঠিকই দূরীভূত হয়, কিন্তু মাত্র ৩-৪ মাস কার্যকর থাকে। যখন ক্যালসিয়াম তার কার্যকরিতা হারিয়ে ফেলে তখন মাটির অম্লত্ব আগের চেয়েও বেড়ে যায়। সুতরাং পরবর্তীকালে কৃষককে আরও বেশী মাত্রায় ক্যালসিয়াম ব্যবহার করতে হয়। আবার মাটিতে অধিক মাত্রায় ক্যালসিয়াম ব্যবহারের ফলে, ম্যাগনেসিয়াম সহ অনেক খনিজ গাছের গ্রহণের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। যাকে অণু-খাদ্য-উপাদানের ঘাটতি বলে। আসলে সুবিয়োজিত জৈবপদার্থই মাটির অম্লত্ব স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

৩.১.২ রোগ পোকা জনিত সমস্যা বৃদ্ধি

যে মাটির গুণগত মান ভাল নেই, সে মাটি ফসল চাষের অনুপযোগী। এরূপ মাটিতে জন্মানো ফসল সুস্থ হয় না বলে সহজেই রোগ ও কীটপতঙ্গ দ্বরা আক্রান্ত হয়। এমতাবস্থায় কৃষক রোগ পোকা দমন করতে বিষ ব্যবহার করে, যা সকল জীবের জন্য ক্ষতিকর। এক্ষেত্রে রোগ পোকা দ্বারা ফসল আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণটি বিবেচনা করা হয় না বলে, সমস্যার সমাধান হয় না বরং পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। রোগ পোকা জনিত সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ সপ্তম পরিচ্ছেদের ৭.২ অংশে "রাসায়নিক পদ্ধতিতে আপদ দমনের ফলে উদ্ভুত দুষ্টচক্র"-এর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.১.২ খাদ্যের গুণগত মান হ্রাস

রাসায়নিক সার দ্বারা উৎপন্ন খাদ্য নিম্নমানের। এ খাবার খেতে বিস্বাদ এবং এর সংরক্ষণ গুণও ভাল নয়। সকলেই একথা বলে থাকে যে, রাসায়নিক সার ও বিষ দ্বারা উৎপন্ন চাল ও সবজি একেবারেই স্বাদহীন এবং এগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বলে বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে রাসায়নিক কৃষির প্রবক্তারা বলে থাকে, জনসাধারণের এ ধারণাটি ভ্রান্ত, এর পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই। আসলে জনসাধারণের এ উপলব্ধিটি সঠিক। এ সকল উৎপন্নদ্রব্য শুধুমাত্র স্বাদ এবং সংরক্ষণ গুণের দিক দিয়েই নিম্নমানের নয়, এদের পুষ্টি-গুণও নিম্নমানের।

সাম্প্রতিক কালে জাপানে, রাসায়নিক উপকরণ দিয়ে উৎপন্ন ও জৈব উপকরণ দিয়ে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পুষ্টি-উপাদানের পার্থক্য নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ফলাফলে দেখা গেছে জৈব পদ্ধতিতে তৈরী ফসলের চেয়ে রাসায়নিক উপায়ে তৈরী ফসল নিম্নমানের। রাসায়নিক উপায়ে তৈরী ফসলে পানির পরিমাণ বেশী। রাসায়নিক উপায়ে তৈরী ফসলে পানির পরিমাণ বেশী থাকাটাই হয়ত বিস্বাদ লাগা ও নিম্ন সংরক্ষণ-মানের অন্যতম প্রধান কারণ।

জৈব ও রাসায়নিক উপায়ে উৎপন্ন ফসলের গুণগত মানের পার্থক্য

গুণাবলী	জৈব উপায়ে তৈরী	রাসায়নিক উপায়ে তৈরী
শুকনা পদার্থ (Dry Matter)	৫.৯০%	৩.৬০%
ভিটামিন সি	৬৭ মিগ্রা/১০০গ্রা.	৩০ মি.গ্রা./১০০গ্রা.
ভিটামিন সি (রান্নার পর)	২৪মি.গ্রা/১০০গ্রা.	১০ মি.গ্রা./১০০গ্রা.
ভিটামিন সি (১০ দিন পর)	৩৮ মি.গ্রা/১০০গ্রা.	২ মি.গ্রা/১০০গ্রা.

নমুনা হিসাবে এক ধরনের চীনা বাঁধাকপি ব্যবহার করা হয়েছে
by study group of sunbongi Agriculture College, Japan - 1985

৩.১.৪ মাটি পানি বাতাস ও কৃষিজাত দ্রব্য দূষণ

কীটনাশক বিষ বিধায় এর ব্যবহারে পরিবেশ দূষণ ঘটে। এগুলো খুবই কার্যকরভাবে প্রাণ সংহার করে এবং এদের ক্ষতিকর প্রভাব দীর্ঘকালব্যাপী বজায়

(অক্ষুণ্ন) থাকে (উ.উ.এঞ-এর মতন বিষের বিষক্রিয়া ১০ বছরেরও বেশী অক্ষুণ্নথাকে)। জীবজগতের জন্য এগুলো প্রকৃতপক্ষেই ভয়ংকর। সর্বপ্রথম বিষক্রিয়ার দ্বারা ফসল দূষিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে মটি পানি ও বাতাস দূষিত হয়। এভাবে দূষণের ফলে কৃষিজাত দ্রব্য বিষাক্ত হয়ে যায়, মাটির গুণগত মান খারাপ হয়ে যায় এবংগ্রামাঞ্চলে মাছ পাখী সহ অন্যান্য জীবজন্তু বিলুপ্ত হতে থাকে।

৩.১.৫ স্বাস্থ্য সমস্যা

জনসাধারণ দু'ভাবে স্বাস্থ্যগত সমস্যার জালে আবদ্ধ হচ্ছে। এর একটি হল বিষাক্ত কৃষিজাত দ্রব্য খওয়ার ফলে এবং অন্যটি হল, বিষের সংস্পর্শে থেকে যে সমস্ত খাবার বিষাক্ত হয়ে যায় তা খেয়ে। সরাসরি বিষাক্ত খাবার খেয়ে দেহে বিষ সঞ্চিত হয়। ফলে স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্বল্পমাত্রায় ব্যবহৃত হয় বলে কীটনাশক জনস্বাস্থ্যের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়-এ তথ্যটি ভুল। কোন ব্যক্তি নিয়মিত বিষাক্ত খাবার খেলে তার দেহে সঞ্চত বিষ বিষক্রিয়া ঘটাবেই।

রাসায়নিক কীটনাশকের আর একটি সমস্যা হল ইহা ব্যবহারকারী কৃষকের দেহে সরাসরি ক্ষতিসাধন করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক তাদের শরীরের জন্য কোনরূপ প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ ছাড়াই কীটনাশক ব্যবহার ব্যবহার করে থাকে। ফলে, এরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এসব বিষাক্ত দ্রব্য অন্য জীরেব জন্য, বিশেষ করে পশু-সম্পদের জন্যও ক্ষতিকর। কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে এমন ফসলের অবশিষ্টাংশ খেয়ে গরু ছাগল মারা যাওয়ার ঘটনা গ্রামাঞ্চলে সচরাচর দেখা যায়।

৩.১.৬ ফসলের স্থানীয় জাতসমূহ বিলোপ

বীজ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জাতসমূহ কৌলিতাত্বিক ভিত্তিন (genetic base) হিসাবে কাজ করে এবং এগুলো ভবিষ্যতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কিন্তু এই স্থানীয় জাতসূহ ক্রমাধিক হারে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর প্রধানতম কারণ হল 'উফশী' জাতের ও সংকর জাতির বীজ প্রবর্তন। এর ফলে চাষীরা স্থানীয় জাতসমূহের আবাদ পরিত্যাগ করে গুটি কয়েক "উফশী" জাতের ও সংকর জাতের ফসল আবাদ করছে। এতে করে একক ফসলের আবাদ ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং কৃষির জন্য পরিবেশগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে।

৩.১.৭ অন্যান্য সমস্যা

এগুলো ছাড়াও, বাংলাদেশের আর একটি গুরুতর সমস্যা হল ভূগর্ভস্থ পানি হ্রাস পাওয়া। বর্তমানে শীত মৌসুমে ‘উফশী’ ধান চাষে সেচ দিতে গভীর নলকূপের সাহায্যে ব্যাপকহারে পানি তোলা হয়, ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে চলে যাচ্ছে। যে সমস্ত এলাকায় গভীর নলকূপের সংখ্যা অধিক, সে সমস্ত এলাকায় হস্তচালিত নলকূপের সাহায্যে পানি তোলা যায় না। পানির এরূপ ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকলে এক সময় ভূগর্ভস্থ পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে। বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানি লৌহমিশ্রিত। এই পানি ব্যবহারের ফলে মাটিতে ক্রমান্বয়ে লৌহ সঞ্চিত হয়, যা নিজেই একটি সমস্যা। এগুলো ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করবে।

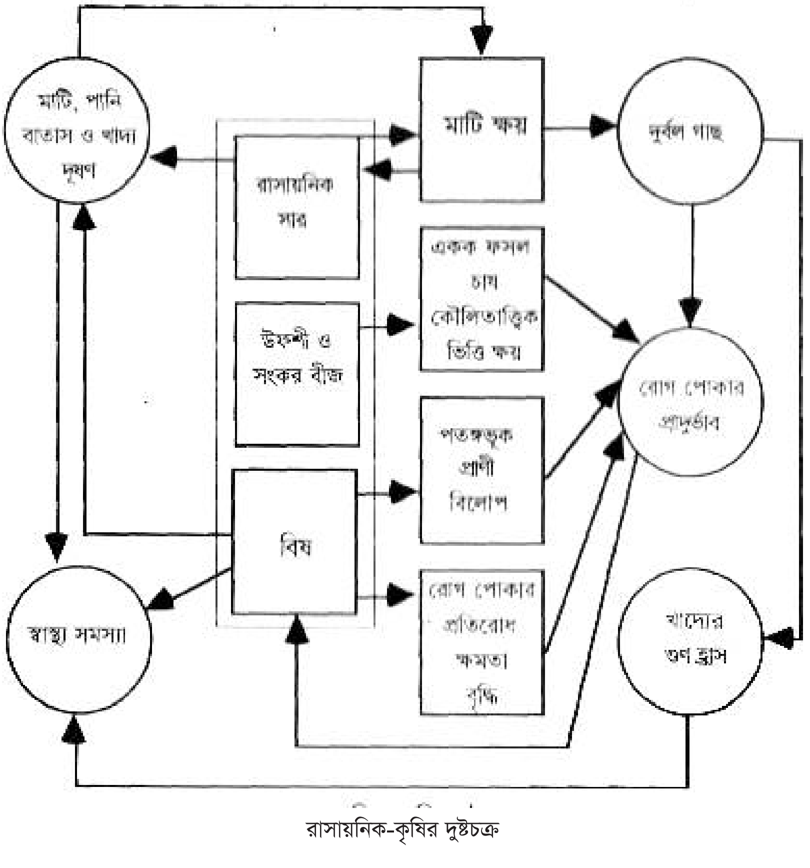

রাসায়নিক-কৃষির দুষ্টচক্র

৩.২ অর্থনৈতিক সমস্যা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসায়নিক কৃষি শুধুমাত্র আর্থিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে। এই কৃষি-পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদন পাওয়ার উদ্দেশ্যে, উচ্চ মাত্রায় উপকরণ ব্যবহার করা হয়, যার পুরোটাই বাহ্যিক এবং অর্থব্যয়ে কিনতে হয়। মনে করা হয়েছিল যে, এতে করে কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে, রাসায়নিক কৃষির কোন তত্ত্বই, যেভাবে মনে করা হয়েছিল, সেভাবে কাজ করছে না। কৃষক যেসকল আর্থিক সমস্যার মুখোমুখী, সেগুলো নীচে আলোচনা করা হ'ল।

৩.২.১ বছর বছর উৎপাদন-ব্যায় বৃদ্ধি

রাসায়নিক কৃষি অনুশীলনে বছর বছর উৎপাদন-ব্যায় বৃদ্ধি পায়, যা কোন ভাবেই এড়ানো সম্ভব নয়। এর কারণ দুটি। যার একটি হল বছর বছর বাহ্যিক উপকরণের পরিমাণ বাড়াতে হয় (সার বিষ ইত্যাতি)। বেশীর ভাগ কৃষক ১৫-২০ বছর পূর্বে উফশী ধানের আবাদ শুরু করে। শুরুর দিকে তারা একর প্রতি ৫০ কেজি সার ব্যবহার করতো (যা মূলতঃ ইউরিয়ার সীমাবদ্ধ ছিল)। বর্তমানে তাদের একর প্রতি ২০০-৩০০ কেজিরও বেশী সার ব্যবহার করতে হয় (ইউরিয়া ছাড়াও চ.ক এবং আরও অনেক) এতদ্‌সত্ত্বেও তারা পূর্বের সমান ফলন পায় না। রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটির গুণগত মান খারাপ হয়ে যাওয়া এর অন্যতম প্রধান কারণ।

অন্য কারণটি হল বছর বছর বাহ্যিক উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন-ব্যায় বৃদ্ধি পায়। ১৯৭২ সালে ১ কেজি রাসায়নিক সারের দাম ছিল মাত্র ০.৫০ টাকা, কিন্তু বর্তমানে তার দাম ৫-৬ টাকা। অর্থাৎ ২০ বছরে সারের দাম বেড়েছে ১০ গুন, অথচ ধানের দাম বেড়েছে মাত্র ২ গুণ।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের ধারা (কেজি/একর)

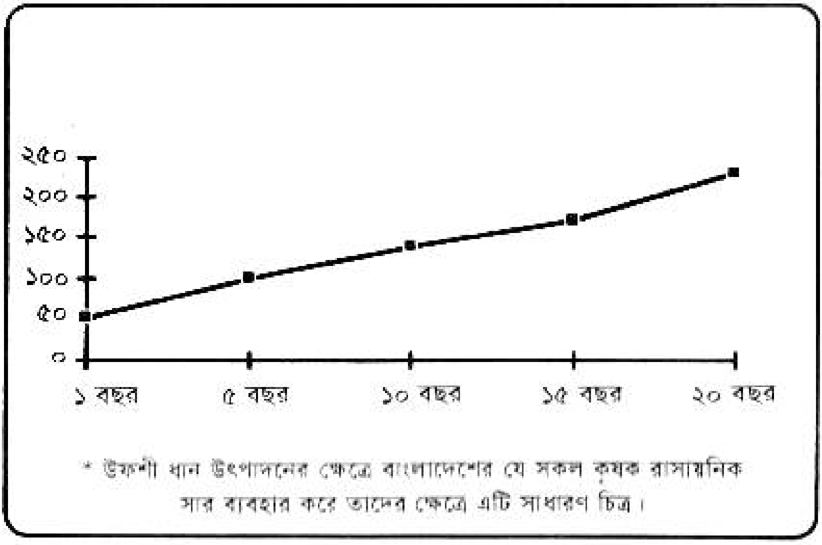

বাংলাদেশে “উফশী” ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি সাধারণ ঘটনা।

-সিমপেটই মুরাকামী, ১৯৯০

বর্তমানে অনেক চাষীর মন্তব্য হল, উচ্চ মাত্রায় সার বিষ ও সেচ প্রয়োগ করে “উফশী” ধানের আবাদ তাদের জন্য মোটেই লাভজনক নয়।

৩.২.২ ফলন হ্রাস পাওয়া

চাষীরা বেশীমাত্রায় ও পরিমাণে বাহ্যিক উপকরণ ব্যবহার করেও পূর্বের মতন ফলন পায় না। একটি উদাহরণ: একজন কৃষক ১৫ বছর পূর্বে “উফশী” ধান চাষ শুরু করে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে সে প্রথম দিকে একর প্রতি ৭০ মন ধান পেতো (২৬০০ কেজি/একর) বর্তমানে ফলন ভাল হলে সে একর প্রতি ৫০ মণ ধান পায় (১৮৬০ কেজি/ একর)। এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং এটিই সাধারণ ঘটনা। যে সব কৃষক রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করে ধান উৎপাদন করে তাদের সকলেরই এ ধরনের অভিজ্ঞতা আছে।

মাটির গুণগত মান খারাপ হয়ে যাওয়া উৎপাদনহ্রাস পাওয়ার কারণ। এটি অতীব সত্য যে, খারাপ মাটি কখনই ভাল ফলন দেয়না।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের ধারা (কেজি/একর)

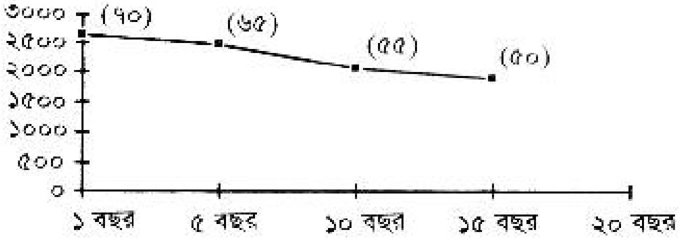

* বাংলাদেশের যে সকল কৃষক উফশী ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি-রাসায়নিক ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রে এটি সাধারণ ব্যাপার।

যে সব কৃষক রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে "উফশী" ধান আবাদ করছে তাদের ক্ষেত্রে এটি সাধারণ ঘটনা।

-সিমপেই মুরাকামী

৩.৩ সামাজিক সমস্যাবলী

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, প্রযুক্তি পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট নয়। প্রযুক্তি মানুষের জন্য মঙ্গলকর কি-না তা নির্ভর করে যে ব্যক্তি প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা উপর। যেমন, একটি চাকু রান্নর কাজে অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হলে এটি কারো মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। যাই হোক, এরূপ সাধারণ ধারণা সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। প্রযুক্তিরও একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এটি প্রবর্তন করে এবং এর উন্নয়ন সাধন করে তার বা তাদের অভিজ্ঞতা শিক্ষাদীক্ষা এবং যে সমস্য পরীক্ষার দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয় তার উপর নির্ভরশীল।

কতক প্রযুক্তিব্যবহারে কম শক্তি ব্যবহৃত হয় এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণের প্রয়োজন পরে। আবার পরিবেশগত দিক বিবেচনায়ও সেগুলি নিখুঁত। অনেক প্রযুক্তিব্যবহারে অধিক শক্তি ও বাহ্যিক উপকরণের প্রয়াজন হয় এবং পরিবেশের জন্যও সেগুলি ক্ষতিকর। যে কোন প্রযুক্তি প্রবর্তিত হওয়ার পর তা কোন না কোন ভাবে পরিবেশকে প্রভাবিত করে। যে প্রযুক্তিব্যবহার বাহ্যিক উপকরণ-নির্ভর এবং প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ, সে প্রযুক্তি সমাজকে প্রভাবিত করে এবং সে প্রভাব সচরাচর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশে সবুজ বিপ্লবের নামে রাসায়নিক কৃষি প্রবর্তনের ফলে উক্ত ঘটনাটিই ঘটেছে। বাংলাদেশে রাসায়নিক কৃষি প্রবর্তনের ফলে যে সমস্ত সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল।

৩.৩.১ ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ সমস্যাটি নিয়েই উন্নয়নশীল দেশসমূহে সবচেয়ে বেশী সমালোচনা হয়েছে। এর কারণ দুটি। যার একটি হল রাসায়নিক কৃষি প্রবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়, যখন সুযোগ ও সম্পদ সীমিত ছিল তখন কেবল ধনীরাই এ প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পেরেছে। কারণ, রাসায়নিক কৃষি-প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যিক উপকরণ ক্রয় করার মতন যথেষ্ট অর্থ এবং প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণের সামাজিক ক্ষমতা ধনীক শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ ও গরীব কৃষকদের জন্য এ প্রযুক্তি গ্রহণের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। অন্য কারণটি রাসায়নিক কৃষির বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত। প্রযুক্তিটি ব্যবহারে মোটামুটি দশ বছর পর্যন্ত স্থানীয় জাত সমূহের তুলনায় অধিক ফলন পাওয়া যায় এবং এই সময়ব্যাপী এ কাজ লাভজক বলে বিবেচিত হয়। মাত্র দশ বছর সময় সকল কৃষক কর্তৃক এ প্রযুক্তিটি গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু যারা এটি গ্রহণ করে (ধনী কৃষক) এবং যারা এটি গ্রহণ করতে পারে না (গরীব কৃষক) তাদের মধ্যকার ব্যবধান বৃদ্ধি করতে এ সময়ই যথেষ্ট।

৩.৩.২ পরনির্ভরশীল করে তোলা

রাসায়নিক কৃষি অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ব্যবহারিক জ্ঞান উভয়ই বহির্বিশ্ব থেকে আমদানি করা। উপকরণগুলি কারখানায় উৎপন্ন এবং এর

ব্যবহারিক জ্ঞান কৃষি বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রবর্তিত। এই ব্যবহারিক জ্ঞানের সাথে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত জ্ঞান কিংবা পুরুষানুক্রমিক কৃষিপদ্ধতির কোন সম্পর্ক নাই। বরং রাসায়নিক কৃষি পদ্ধতির দ্বারা কৃষির স্থানীয়ভাবে-প্রাচলিত জ্ঞানকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এভাবে রাসায়নিক কৃষি-প্রযুক্তি কৃষকদের বস্তুগতভাবে এবং মানসিকভাবে পরনির্ভরশীল করে ফেলেছে। এর ফলে কৃষক তার স্বাতন্ত্র ও আত্মবিশ্বাস হারিয় ফেলেছে-যা তার নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আন্তর্জাতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলো শিল্পোন্নত দাতা দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। দাতা দেশগুলো রাসায়নিক কৃষির উন্নয়নে সাহায্য ও সহযোগিতার নামে উপকরণ বিক্রি করছে। রাসায়নিক কৃষির উন্নয়নের নামে বৈদেশিক সাহায্যের আর একটি প্রেক্ষিত হল, উন্নয়ণশীল দেশসমূহে তাদের-দেশে- তৈরী কৃষির উপকরণ (সার, বিষ, সেচ যন্ত্র) বিক্রির বাজার সৃষ্টি করা।

৩.৩.৩ পুরুষানুক্রমিক কৃষি-পদ্ধতি এবং সেই বিষয়ের জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে

কৃষি বিজ্ঞানীরা পুরুষানুক্রমিক (Traditional) কৃষিপদ্ধতিকে মান্ধাতা আমলের এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে গণ্য করে। ফলে, আস্তে আস্তে পুরুষানুক্রামিক কৃষির কলাকৌশল বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কৃষকদের বোঝানো হচ্ছে যে, মাটির উর্বরতা বিধানের জন্য রাসায়নিক সার এবং রোগ পোকা দমনের জন্য বিষ ব্যবহারই উত্তম। অন্য কোন সমস্যা দেখা দিলেও তারা সাহায্যের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর কাছে যায়। এভাবে তারা কৃষি সম্পর্কে পুরুষানুক্রমিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

পুরুষানুক্রমক কৃষিপদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পরিবেশগত দিক বিবেচনায় তা নিখুঁত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণ স্বরূপ, কৃষকরা মাটি উর্বর করার জন্য ১-২ মাস বয়সের ধৈঞ্চা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতো। ধৈঞ্চা লিগিউম জাতীয় দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদ এবং এরা মাটিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। ধৈঞ্চা মাটিতে নাইট্রোজেন সংযোজন করে, একথা কৃষকরা জানতো না বটে, কিন্তু তারা এর কার্যকারিতা বুঝতে পারতো। সেকালে মাটির উর্বরতা বিধান, রোগ পোকা ব্যবস্থাপনা, শস্য উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক স্থানীয় পদ্ধতির প্রচলন

ছিল। ঐ সকল পদ্ধতি ছিল স্থায়ী, বাহ্যিক উপকরণের উপর কম নির্ভরশীল এবং পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে নিখুঁত।

কৃষিবিজ্ঞানীরা যদি পুরুষানুক্রমিক কৃষিপদ্ধতির গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং তার উপর ভিত্তি করে কৃষি উন্নয়নের চেষ্টা করে, তবে তা দেশ ও দেশের কৃষকদের জন্য বিশেষ উপকারী হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে তারা পুরুষানুক্রমিক কৃষিপদ্ধতিকে মান্ধাতা আমলের এবং অবৈজ্ঞানিক বলে গণ্য করে। এর ফলে কৃষি সম্পর্কিত স্থানীয় জ্ঞান আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমা মুরুব্বিদের পরামর্শক্রমে উর্বরাভূমিকে
দুই দশাব্দেরও কম সময়ে মরুভুমিতে পরিণত করার জন্য
বিপুল পরিমাণ এনার্জি, রাসায়নিক উপকরণ পানি সম্পদ
এবং পুঁজিনির্ভর কৃষি কৌশল তৃতীয় বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে
পড়েছে কৃষি উন্নয়নের নামে–যাকে বলা হয়েছে
“সবুজ বিপ্লব”

বন্দনা শিব
Staying Alive

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরিবেশসম্মত কৃষির নীতিমালা

যদি আমরা রাসায়নিক কৃষি-সৃষ্টি সমস্যাগুলো বুঝতে পারি, তাহলে কোন বিকল্প কৃষিপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা গভীরভাবে অনুভব না করে পারিনা। তেমন পদ্ধতির বৈশিষ্ট নিম্নরূপ হওয়া উচিত:

১) প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটাবেনা।

২) উৎপাদনক্ষমতা রাসায়নিক কৃষির সমান কিংবা তুলনামূলকভাবে বেশী হবে

৩) পদ্ধতিটি টেকসই হবে

৪) বাহ্যিক উপকরণের উপর কম নির্ভরশীল থাকবে।

বিকল্প কৃষিপদ্ধতি হিসাবে আমরা পরিবেশসম্মত কৃষিপদ্ধতির প্রবর্তন প্রস্তাব করছি- যার ভিত্তি হল প্রাকৃতিক অরণ্যের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ-পদ্ধতি। বারোমাস উৎপাদন, স্থায়িত্ব, মাটি সংরক্ষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক অরণ্যে নিখুঁত পদ্ধতি বিরাজমান। সুতরাং আমরা পরিবেশসম্মত কৃষির মূলনীতিগুলি প্রাকৃতিক অরণ্য থেকেই সনাক্ত করতে পারি।

এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়ঃ

পরিবেশসম্মত কৃষির মূলনীতিঃ

১) বৈচিত্র

২) প্রাণবন্ত মাটি

৩) পুনঃ প্রাণন

৪) বহুস্তরবিশিষ্ট গঠন।

৪.১ বৈচিত্র্য

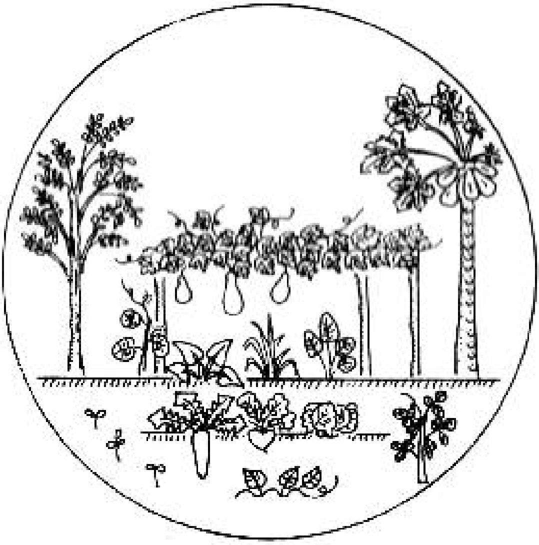

প্রাকৃতিক অরণ্যে রোগ পোকা জনিত সমস্যা প্রায় নেই বলনেই চলে। অণুজীব, প্রাণী এবং উদ্ভিদের প্রজাতি ও জাতসমূহের বৈচিত্রই এর কারণ। উদাহরণ স্বরূপ, প্রাকৃতিক অরণ্যের প্রতি একর জমিতে প্রায় ১০০ উদ্ভিদ প্রজাতি বর্তমান। কিন্তু এক একর কৃষি-জমিতে প্রজাতির বৈচিত্র্য খুবই কম এবং বর্তমানে একক ফসলের চাষকে উৎসাহিত করা হয় বলে এই সংখ্যা একটিতে পৌঁচেছে।

শুধুমাত্র বৈচিত্র্যই পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করে। একক ফসলের আবাদ পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত করে এবং রোগ পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটার মতন পরিবেশ

সৃষ্টি করে। সুতরাং খামারের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পরিবেশসম্মত কৃষি বৈচিত্র্য বৃদ্ধিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়।

ইহা ছাড়াও খামারের বৈচিত্র্য আয়ের উৎস বাড়য়-যা ঐ খামারে সকর ফসলহানির ঝুঁকিও কমায়। বৈচিত্র্য নিশ্চায়ক খামার-পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. বিচিত্র ফসলের আবাদ (৬.৩)

২. মিশ্র ফসলের চাষ (৬.৫)

৩. শস্য আবর্তন (৬.৪)

৪. খামারের চৌহদ্দিতে স্থায়ী গাছ ও ঘাস (৫.৫)

৫. বিবিধ প্রাণী পালন (গবাদিপশু, মাছ, মৌমাছি)

৪.২ প্রাণবন্ত মাটি

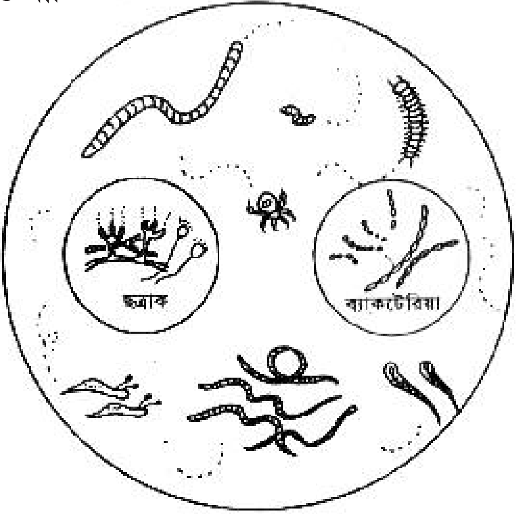

মাটি শুধুমাত্র উদ্ভিদের অবলম্বনদানকারী এবং পানি ও পুষ্টি-উপাদানের ধারক হিসাবে বিবেচ্য ভৌত পদার্থ নয়। ইহা প্রাণবন্ত।

রাসায়নিক কৃষিপদ্ধতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি অনুপস্থিত বলে মাটির গুনগত মানের অবক্ষয় সয়কটজনক অবস্থায় পৌঁচেছে। প্রকৃতিগতভাবে এ সমস্যাটির

উদ্ভব হয় নাই। বরং মাটি সম্পর্কে কৃষক ও কৃষিবিদদের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এবং মটিকে কম গুরুত্ব দেওয়ায় কৃত্রিমবাবে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। মাটির গুনগত মান পুনরুদ্ধারের জন্য মাটি সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। মাটিকে জড়পদার্থ হিসাবে বিবেচনা না করে প্রাণবন্ত হিসাবে গণ্য করতে হবে।

প্রাণবন্ত মাটির অর্থ হল মাটিতে প্রচুর সংখ্যায় অণুজীবের উপস্থিতি। মাটির উর্বরতা এবং ফসল চাষের উপযোগিতা অণুজৈবিক কার্যাবলী দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেহেতু জীবের জন্য খাদ্য ও যত্নের প্রয়োজন, সেহেতু মাটির জন্যও খাদ্য ও যত্নের প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত বিষয়াবলী প্রাণবন্ত মাটির নিশ্চয়তা দেয়ঃ

১. মাটিতে নিয়মিত জৈব পদার্থের যোগান দিয়ে মাটিকে খাওয়ানো (৫.১)
২. মাটির ক্ষয় রোধের জন্য মাটির উপরিভাগ ঢেকে রাখা (৫.১)
৩. রাসায়নিক সার, বিষ ইত্যাদির মতন ক্ষতিকর পদার্থ মাটিতে প্রয়োগ না করা (৫.১)।

৪.৩ পুনঃপ্রাণন

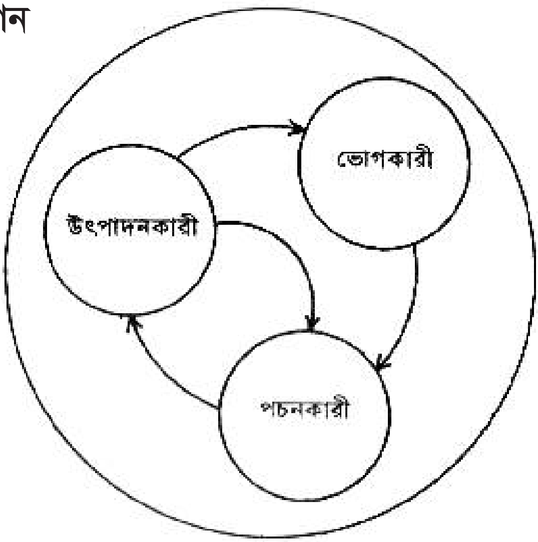

প্রাকৃতিক অরণ্যে মাটির ওপর ভিত্তিশীল একটি পুষ্টিচক্র বিদ্যমান। সব কিছুই মাটি থেকে আসে এবং মাটিতে ফেরৎ যায়। এভাবে আবর্তিত হয় বলে প্রকৃতিতে কোন কিছুই অপ্রয়োজনীয় নয়। পালাক্রমে সবকিছুই প্রয়োজনীয় হয় এবং প্রয়োজনে লাগে। সম্পদের যথাযথ ও সঠিক ব্যবহারের জন্য এই আবর্তন অপরিহার্য। বর্তমানে কৃষিকাজ অনুশীলনে এই আবর্তন-ধারা সর্বদাই বিঘ্নিত হয় বলে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়।

ফসল সংগ্রহের সময় উৎপন্ন প্রায় সব বায়োমাস জমি থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। ফসল সংগ্রহের পর মাটির জন্য বলতে গেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সাধারণত, রাসায়নিক সার হিসেবে মাটিতে কিছু খনিজ যোগ করা হয়, যা মাটির উর্বরতা নিঃশেষ করে দেয়। বাণিজ্যিকভাবে প্রানী পালনের বেলায় একজন কৃষক স্বল্প পরিসরে যথাসম্ভব বেশীসংখ্যক গবাদিপশু কিংবা হাঁস-মুরগী পালন করে। সকল পশুপাখী এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বাহির থেকে অর্থব্যয়ে কিনতে হয়। এই ধরনের খামারের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রী করে কৃষক যথেষ্ট লাভবান হতে পারে সত্য, কিন্তু একই সাথে গরুর গোবর কিংবা মুরগীর বিষ্ঠা নিয়ে কৃষক বিপাকে পড়ে। কারণ এ ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ গোবর কিংবা মুরগীর বিষ্ঠা ব্যবহার করার মতন যথেষ্ট যায়গা কৃষকের নাই। এরুপ ঘটনা ঐ এলাকার জন্য স্বাস্থ্য-সমস্যার সৃষ্টি করে - যাকে গবাদিপশু দ্বারা ঘটিত দূষণ (Live Stock Pollution) বলে। (জাপানের এরুপ সমস্যা সচরাচর ঘটে থাকে)। এভাবে আবর্তন-ধারা বিঘ্নিত হলে সমস্যা চরমে পৌছে। সমস্যার একটি হল জৈব পদার্থের অভাবে মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং অন্যটি হল অত্যধিক জৈব পদার্থের জন্য দূষণ।

পুষ্টির আবর্তন-ধারা সম্পর্কে কৃষক ও কৃষিবিদদের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকা এবং সবকিছুর সাথে সম্পর্কের কথা বিবেচনা না করে কোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়ার প্রবণতার জন্য সমস্যাগুলি সৃষ্টি হয়। সুতরাং সমস্যা সমাধান করতে আবর্তন ধারা সম্পর্কে জ্ঞান এবং একই সাথে কৃষিকাজ অনুশীলনে কিভাবে পুনরাবর্তন ঘটানো যায় সে সম্পর্কে চিন্তা থাকা অত্যন্ত জরুরী। বাহ্যিক উপকরণের ব্যবহার কমিয়ে, স্থায়ীভাবে সহজলভ্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে খামারকে লাভজনক করতে পুনরাবর্তন অপরিহার্য।

মৎস চাষ

মৎস চাষ করতে বিশেষজ্ঞরা পুকুরে কোন জলজ উদ্ভিদ জন্মাতে কিংবা পুকুর পাড়ে গাছ বা ঘাস লাগাতে চায়না। কারণ, তারা মনে করে, গাছের ছায়া এবং জলজ উদ্ভিদ প্লাংকটন ও মাছের উৎপাদন ব্যহত করে। তারা পুকুর ও পুকুর-পাড় পরিচ্ছন্ন রাখে। বাহির থেকে মাছের খাবার ক্রয় করে এবং উৎপন্ন মাছ বিক্রয় করে। মাছ চাষের এই প্রচলিত পদ্ধতিতে পুনরাবর্তন প্রক্রিয়া ঘটছে না বলে কতক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমনঃ পুকুর-পাড় পরিচ্ছন্ন থাকার ফলে বৃষ্টিতে পাড় ভেঙ্গে যায়। পুকুরে কোন জলজ উদ্ভিদ না থাকায় অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় এবং মাছ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এরপর চিকিৎসার জন্য ঔষধ (রাসায়নিক) এবং অক্সিজেন সরবরাহের জন্য যন্ত্র ক্রয়ের প্রয়োজন হয়। এতে করে মাছের সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়া হয়ত সম্ভব; কিন্তু বহুবিধ সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। এতে সকল মৎস সম্পদের মৃত্যুর ঝুঁকি সৃষ্টি হয় এবং তাৎক্ষণিক অস্থায়ী সমাধান করতে গিয়ে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

পুকুর-পাড়ে গাছ ও ঘাস লাগানো হলে এবং পুনরাবর্তনের ধারণা অনুসারে কাজ করলে অনেক দিক থেকে লাভবান হওয়া যাবে।

১. গাছ ও ঘাস পুকুরের পাড়কে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করে, ফলে পুনঃখননের প্রয়োজন হয়না

২. ঘাস এবং গাছের পাতা গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়

৩. জলজ উদ্ভিদ, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে কিছু হাঁস পালন কার যায়

৪. গোবর, মুরগীর বিষ্ঠা, গাছের পাতা এবং ঘাস দ্ধারা তৈরী কম্পোস্ট মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়; এতে করে মাছের জন্য খাদ্য ক্রয়ের প্রয়োজন হয় না

৫. জলজ উদ্ভিদ অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমে পানি পরিশ্রুত করে এবং মাছ ভালভাবে বাড়তে পারে

৬. গাছ লাগানোর কয়েক বছরের মধ্যেই বিভিন্ন রকম ফলের উৎপাদন পাওয়া সম্ভব; যা আয়ের উৎস বৃদ্ধি করে

৭. অন্যান্য সুবিধার মধ্যে জ্বালানি, উর্বরতার জন্য জৈবপদার্থ এবং সর্বোপরি খামারের অভ্যন্তরে পরিবেশগত ভারসাম্য সৃষ্টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরুপ অনুশীলন মাছের উৎপাদন কিছুটা কমাতে পারে, কিন্তু অন্যান্য উৎস থেকে আয় বাড়াবে। এছাড়াও বাহ্যিক উপকরণ ক্রয়ের ব্যয় ও মাছের রোগ কমে যাবে, ফলে প্রচলিত মৎস চাষ পদ্ধতির চেয়ে তুলনামূলকভাবে প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাবে।

এভাবে পুনরাবর্তনের ধারণা অনুসারে কাজ করে অনেক সমস্যা সমাধান করা যায় এবং অধিক লাভবান হওয়া যায়। এজন্য মৎস-চাষ-বিশেষজ্ঞদের দরকার বিশেষজ্ঞতার ফাঁদ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা।

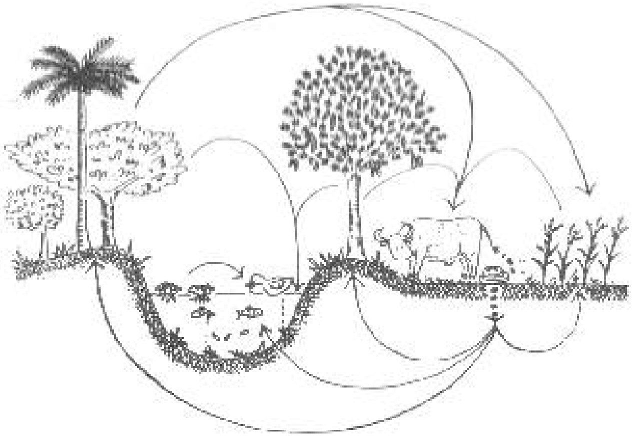

৪.৪ বহুস্তরবিশিষ্ঠ কাঠামো

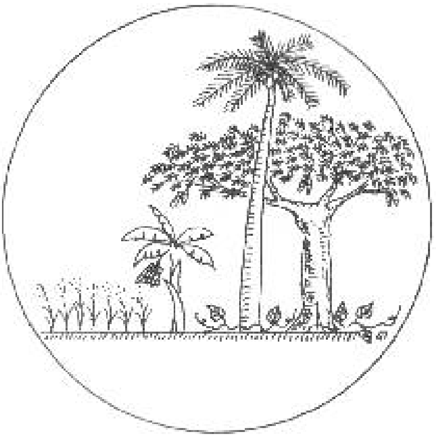

কৃষির বেলায় উৎপাদনের প্রকৃত উৎস হল সূর্যালোক ও বৃষ্টির পানি। প্রাকৃতিক অরণ্যে বায়োমাস উৎপাদন কৃষির তুলনায় বেশী। এর কারণ,অরণ্যের বহুস্তরবিশিষ্ট কাঠামো- যা সূর্যালোক ও বৃষ্টির পানি সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগাতে পারে। সচরাচর, কাঠামোগতভাবে ফসলের মাঠ আনুভূমিক, যা উক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগাতে পারে না। কৃষি-জমিতে সূর্যালোক ও বৃষ্টির পানি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হলে তা ফসলের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে। যদি এমনটি না হয়, তাহলে সূর্যালোক ও বৃষ্টির পানি খরাও ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ হয়ে দাড়ায়। প্রখর সূর্যালোক ও প্রবল বৃষ্টিপাত উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, সুতরাং এ সমস্ত অঞ্চলের খামার গুলির বহুস্তরবিশিষ্ট কাঠামো অত্যন্ত জরুরী।

যে সমস্ত বিষয় একটি খামারকে বহুস্তরবিশিষ্ট কাঠামোতে রুপদান নিশ্চিত করে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো;

১) খামারের চৌহদ্দি বরাবর বহুবিধ প্রজাতির স্থায়ী গাছ লাগানো এবং নীচে ছায়াসহিষ্ণু ফসলের আবাদ করা।

২) সুষ্ঠু বিন্যাসে ফসলের গাছ লাগানো ও বর্ষজীবী ফসলের আবাদ করা।

মহাবিশ্ব থেকে রৌদ্র, বাতাস এবং বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক উপাদানগুলি এনার্জিরূপে আমাদের পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়। আমাদের ভূপৃষ্ঠেজাত কিছুজীব, প্রযুক্তি, অজৈব অংশ উক্ত উপাদানগুলিকে রূপান্তরিত করে নানা ধরনের উপযোগী সঞ্চয়ে পরিণত করে- যাকে আমরা সম্পদ বলি।

বিল মলিসন
(Permaculture-A designer’s mannual)

দ্বিতীয় অংশ

ক. চরম জলবায়ুর কারণে সৃষ্ট কৃষির সমস্যা

১. প্রবল বৃষ্টিপাত ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ। আষাঢ় থেকে ভাদ্র এই সময়ে অধিক বৃষ্টির কারণে কৃষক অনেক সমস্যায় পড়ে যায়।

-(জুন-১৯৮৮ প্রশিকা খামার)

২. অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন এ সময়টাতে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। খড়া মৌসুমে পানির অভাবে কৃষিকাজ ব্যহত হয়।

-(জুন-১৯৮৮ প্রশিকা খামার)

খ. সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পরিবেশসম্মত কৃষিপদ্ধতি:

৩. সীমানা বরাবর গাছ ও ঘাস লাগানো। একটি খামারের সীমানা বরাবর জন্মানো লেমন ঘাস ও ইপিল ইপিল গাছ। ভূমিক্ষয় রোধে গাছ ও ঘাস অনন্য। ইহা খামারে বহুস্তরবিশিষ্ট কাঠামো তৈরী করে ও বৈচিত্র্য দান করে।

-(নভেম্বর–১৯৮৯, প্রশিকা খামার)

৪. বেগুন ক্ষেতে লেমন ঘাসের সাহায্যে জাবড়া প্রয়োগ করা। জাবড়া, প্রবল বৃষ্টির সময় ভূমিক্ষয় রোধ করে এবং প্রচণ্ড রোগের সময় বাষ্পীভবন কমায়।

-(ফেব্রুয়ারী–১৯৯১, প্রশিকা খামার)

৫. কম্পোষ্ট

কম্পোষ্ট তৈরীর উদ্দেশ্যে জড়ো করা ধৈঞ্চাপাতা। পুনরাবর্তন ও জীবন্ত মাটি তৈরির জন্য কম্পোস্ট খুবই উপযোগী।

৬. সবুজ সার

শুষ্ক শীত মৌসুমে আচ্ছাদন ফসল ও সবুজ সার হিসেবে খেসারী ডাল। স্ত্রী মারী ও সন্তান নবুকীসহ লেখক।

-(ফেব্রুয়ারী - ১৯৯১, প্রশিকা খামার)

গ. উৎপাদনশীল চৌহদ্দি

৭. বায়ুরোধক

বায়ুরোধক হিসেবে ইপিল ইপিল ও অন্যান্য জটিল উদ্ভিদ।

৮. জৈব পদার্থ উৎপাদন

বেগুন ক্ষেতের পাশে লাগানো ফ্লামেঞ্জিয়া গাছ -এর পাতা জাবড়া ও কম্পোস্ট উপকরণ হিসেবে উত্তম।

৯. জ্বালানী

জ্বালানী হিসেবে ইপিল ইপিলের ডাল উত্তম।

১০. জৈব সার

ইপিল-ইপিলের পাতা জাবড়ার উপকরণ হিসেবে উত্তম।

১১. ফল

জমির সীমানা বরাবরে জন্মানো পেঁপে গাছ।

১২. পেঁপে

স্থানীয় জাতের উচ্চ ফলনশীল পেঁপে। এরূপ একটি গাছ থেকে ৫০ কেজিরও বেশি পেঁপে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঘ. প্রশিকার নিজস্ব খামারে প্রাপ্ত পরিবেশসম্মত কৃষির ফলাফল

১৩. সবুজসার জাবড়াসহ বাঁধাকপি। সবুজসার জাবড়া হিসেবে মাসকলাই ব্যবহার করে বাঁধাকপির চারা রোজণ করা হয়েছে।

১৪. বাঁধাকপি

তিন মাস পরে বাঁধাকপি। গড়ে প্রতিটি বাঁধাকপির ওজন ২ কেজি। রোগ-বালাইহীন। বাড়তি কোন সার প্রয়োগ ছাড়া চাষ।

১৫. মিশ্র ফসল

মরিচের সাথে মিষ্টি কুমড়া। বাংলাদেশে প্রচলিত মিশ্র ফসলের উদাহরণ।

১৬. মিষ্টি কুমড়া

মিশ্র ফসল হিসেবে ১৫ কেজি ওজনের মিষ্টি কুমড়া।

১৭. ফুলকপি
বাঁধাকপির অনুরূপ পদ্ধতিতে জন্মানো ফুলকপি।

১৮. মাষ্টার পিস
২.২ কেজি ওজনের ফুলকপি। মানুষ সমস্যা সৃষ্টি না করলে, কোন-রাসায়নিক সার বা বিষ ছাড়াই ভাল উৎপাদন সম্ভব।

ঙ. অন্যান্য

১৯. ইপিল-ইপিল

দ্রুত বর্ধনশীল ও বহু ব্যবহারোপযোগী উদ্ভিদ। এটি বছরে ২/৩ বার কর্তন করা যায়। পাতা গোখাদ্য ও সার হিসেবে উত্তম এবং ভাল জ্বালানী হিসেবে উত্তম।

২০. সীম

সবজী হিসেবে উত্তম। এটি প্রচুর জৈব পদার্থ উৎপাদন করে এবং শুষ্ক মৌসুমে আচ্ছাদন-ফসল হিসেবে খুবই উপযোগী।

২১. মিশ্র ফসল

একই জমিতে জন্মানো মূলা, সরিষা এবং আলু। এটি একটি প্রচলিত পদ্ধতি। ইহা বৈচিত্র্য বাড়ায় এবং রোগ পোকার আক্রমণ কমায়।

২২. জয়ন্তী

দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদ হিসেবে জয়ন্তি সুপরিচিত। মাত্র ৮ মাসে এটি ১৪ ফুট উঁচু ও ৪ ইঞ্চি পরিধির হয়ে যায়।

২৩. ছায়াসহিষ্ণু ফসল

আম গাছের ছায়ায় জন্মানো আদা ও হলুদ।

২৪. শাপলা

পানিতে অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমে পানি শোধনের জন্য জলজ উদ্ভিদ। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাটির উর্বরতাবিধান এবং তা অক্ষুণ্ন রাখা

কৃষিকাজে মাটির উর্বরতা একটি প্রধান জরুরী বিষয়। প্রত্যেক সচেতন চাষী পর্যাপ্ত ফলন বজায় রাখার জন্য মাটির উর্বরাশক্তি ধরে রাখতে চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে, কেবল নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম ও ফসফরাসের মত কতক মুখ্য পুষ্টি-উপাদানে সমৃদ্ধ হলেই তা 'ভাল মাটি' হয় না। মাটি অবশ্যই সুগঠিত এবং জৈবগুণে সমৃদ্ধ হতে হবে। ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুণে সমৃদ্ধ মাটিকে আমরা সেরা মাটি হিসাবে বিবেচনা করি।

অনেক কৃষক আছে, যারা মাটির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর জন্য সার প্রয়োগের মাধ্যমে পুষ্টি-উপাদান সরবরাহ করে। খুব কম সংখ্যক কৃষক মাটি সংরক্ষণের মাধ্যমে উর্বরাশক্তি অক্ষুণ্ন রাখা রাখার কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। উদ্ভিদকে পুষ্টি-উপাদান সরবরাহের ক্ষমতা মাটির রাসায়নিক গুণের অন্তর্ভূক্ত; কিন্তু মাটি সংরক্ষণ ও উর্বরাশক্তি অক্ষুণ্ন রাখে যথাক্রমে মাটির ভৌতগুণ ও জৈবগুণ। ভূমিক্ষয় কৃষির জন্য সমস্যা হওয়ার মূল কারণ এটাই। আমরা যদি এ বিষয়ে চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারব যে মাটির উর্বরাতবিধান ও তা অক্ষুণ্ন রাখা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়:

১. মাটির উর্বরাতাবিধান ও তা অক্ষুণ্ন রাখার মূলসূত্র

২. মাটির উর্বরতাবিধান ও তা অক্ষুণ্ন রাখার পদ্ধতি

⇒ জাবড়া প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্প কর্ষণ

⇒ সবুজ সার

⇒ কম্পোস্ট

⇒ সীমানা বরাবর স্থায়ী গাছ ও ঘাস লাগোন।

৫.১ মাটির উর্বরতা বিধান এবং তা অক্ষুণ্ন রাখার মূল সূত্র

মাটির উর্বরতা বিধান এবং তা অক্ষুণ্ন রাখার আদর্শ নমুনা প্রাকৃতিক অরণ্যে বিদ্যমান।

নিয়মিত জৈব পদার্থ যোগদান দেয়া

উৎপন্ন জৈব পদার্থ মাটিতে ফেরৎ দেয়া এবং মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করা একটি জরুরী বিষয়। শুধুমাত্র জৈব পদার্থই উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ যোগান দিতে পারে এবং মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুণাবলীর উন্নয়ন সাধন করতে পারে। মাটিতে বিদ্যমান হিউমাস মণিকীভবনের ফলে হ্রাস পেতে থাকে। মাটির উর্বরাশক্তি ওগুণাগুণ অক্ষুণ্ন রাখতে হারানো হিউমান পুনঃসরবরাহ আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে প্রতি বছর একর প্রতি ৮ টান জৈব পদার্থ সরবরাহ করা প্রয়োজন। মাটির দ্রুত উন্নয়নের জন্য অথবা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা বিনষ্ট মাটি সংশোধনের জন্য এই মাত্রার দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রথম বছর এক প্রতি ১৬ টন জৈব পদার্থ সরবরাহের সুপারিশ করা হয়। জাবড়া প্রয়োগ, সবুজ সার, কম্পোস্ট প্রয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করা যায়। মাটিতে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ যোগান দিতে পারলে কখনও কোন ফসলে পুষ্টি জনিত অভাব দেখা দেয়না। খামারের অভ্যন্তরেই প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থের উৎপাদন করতে পারা সর্বোত্তম।

মাটি ঢেকে রাখা

লতাপাতা অথবা জৈব পদার্থ দ্বারা মাটির উপরিভাগ সর্বদা ঢেকে রাখা উচিত। অনাবৃত মাটি সহজেই বৃষ্টিপাত, বাতাস ও সূর্যের তাপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটা ভূমিক্ষয় এবং মাটির গুণাগুন হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ।

মাটিতে তাজা জৈব পদার্থ মিশানো ঠিক নয়

অবিয়োজিত তাজা জৈব পদার্থ মাটিতে মিশানো উচিত নয়। কারণ, বিয়োজন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এটা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমনঃ

১. জৈব পদার্থের বিয়োজনের সময় মাটিতে শিকড়ের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়।
২. শিকড়ের জন্য ক্ষতিকর মিথেন গ্যাস সৃষ্টি হয়।
৩. জৈব এসিড সৃষ্টি হয়, যা মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি করে।
৪. ক্ষতিকর ছাত্রকের সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে মাটিস্থ অণুজীবের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়-যা ই/ঋ (ব্যাকটেরিয়া/ছত্রাক) অনুপাত হ্রাস করে।

এর সবগুলিই উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর এবং রোগ পোকা জনিত সমস্যা সৃষ্টিকারী। তাজা জৈবপদার্থ জাবড়া (Mulch) হিসাবে মাটির উপরিভাগে প্রয়োগ করা যায়। তাজা জৈবপদার্থ মাটিতে মেমনোর প্রয়োজন হলে, (যেমন সবুজসারে) বীজ বপন কিংবা চারা রোপণের পূর্বে সম্পূর্ণ বিয়োজনের জন্য যথেষ্ট সময় দেয়া উচিত।

সীমানা বরাবর গাছ ও ঘাস লাগানো

খামারের চৌহদ্দি বরাবর স্থায়ী গাছ ও ঘাস লাগিয়ে আচ্ছাদিত রাখা উচিত। এর উদ্দেশ্য হল সীমানার ভাঙ্গন রোধ এবং পানি প্রবাহের মাধ্যমে মাটির ক্ষয় রোধ। এ ছাড়াও বাউণ্ডারী এলাকা জৈবসার, গোখাদ্য, জ্বালানী, ফল, কাঠ ইত্যাদির উৎস হিসাবে কাজ করে এবং সীমানার গাছ বায়ুপ্রতিরোধী হিসাবেও কাজ করে।

রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার না করা

রাসায়নিক সার উদ্ভিদের জন্য কিছুটা পুষ্টি-উপাদান সরবরাহ করে এবং বিষ রোগ পোকা দমন করে দ্রুত ভাল ফলাফল দেখাতে পারলেও এগুলো বর্জন করা উচিত। এগুলো মাটির অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ভারসাম্যহীন করে তোলে। রাসায়নিক সারের

অম্লত্বে অণূজৈবিক কার্যাবলী ব্যাহত হয় এবং বিষ এদের মেরে ফেলে। রাসায়নিক সার ও বিষ উভয়ই অণুজীবদের ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। ফলে রোগ পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এ ছাড়া, রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে কয়েকটি মাত্র পুষ্টি-উপাদান সরবরাহ করা হয় বলে উদ্ভিদের জন্য পুষ্টির সুষমতা বজায় থাকেনা এবং উদ্ভিদ ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়। অনেক কৃষক মনে করে রাসায়নিক সারের সাতে জৈবসার মিশিয়ে ব্যবহার করা ভাল। এ ধরনের কাজও অণুজৈবিক ভারসাম্য ও পুষ্টি-উপাদানের সুষমতা ব্যাহত করে। কখনও এসবের দ্বারা রোগ পোকা জনিত সমস্যার সমাধান করা যায় না।

৫.২ জাবড়া প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্প কর্ষণ

জাবড়া (mulch) হল বিভিন্নি প্রকার জৈব পদার্থ যেমনঃ আগাছা, ঘাস, ঝরাপাতা, খড় ইত্যাদি দ্বারা মাটির উপরিভাগ ঢেকে রাখা। জাবড়ার কাজ হল মাটির উর্বরতা বিধান এবং তা অক্ষুণ্ন রাখা। পর্যাপ্ত জাবড়া প্রয়োগে আবৃত মাটিতে স্বল্প কর্ষণ অনুশীলন করা সম্ভব।

৫.২.১ জাবড়া প্রয়োগের উপকারিতা

মাটি সংরক্ষণ

মাটির উপরিভাগ জাবড়া দ্বারা আবৃত থাকায় সূর্যের তাপ ও বৃষ্টিপাত সরাসরি মাটিতে আঘাত করতে পারে না। কৃষি জমির অনাবৃত মাটি এবং বর্ষা মৌসুমের প্রবল বৃষ্টিপাতই বাংলাদেশে ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ। কর্ষণও অনেক সময় ভূমিক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং জাবড়া প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্প কর্ষণের অনুশীলনই এদেশের জন্য মাটি সংরক্ষণের কার্যকর পদ্ধতি।

পানি প্রবাহের মাধ্যমে ভূমিক্ষয়ের উপর জাবড়া প্রয়োগের মাত্রার প্রভাব

জাবড়া প্রয়োগের মাত্রা (টন/হেক্টর)	পানি প্রবাহ (%)	মাটির ক্ষয় (টন/হেক্টর)
০	৫০	৪.৮৩
২	১৯.৭	২.৪৮
৪	৮	০.৫২
৬	১.২	০.০৫

শস্যহীন জমি; বৃষ্টিপাত ৬১ মিলিমিটার। বন্দনা শিব (Staying Alive)

মাটির ভৌতগুণাবলীর উন্নয়ন ঘটে

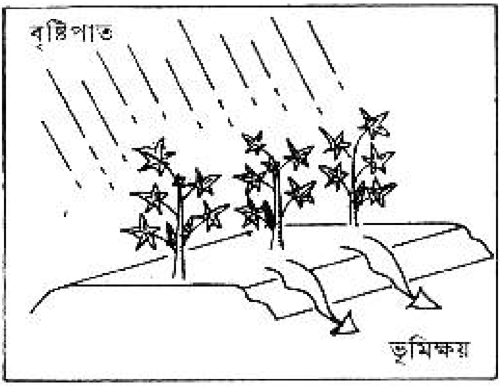

জাবড়া প্রয়োগের মাটির উপরিভাগ আবৃত থাকায় বৃষ্টিপাতের ফলে জমাট বেঁধে যায় না এবং রোদের তাপে শুকিয়ে যায়না। জাবড়া মাটির উপরিভাগকে ঝুরঝুরে করে রাখে, যা, মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং মাটির পানি ধারণক্ষমতা বাড়ায়। জাবড়া শুকনো মৌসুমে মাটির বাস্পীভবন রোধ করে এবং আর্দ্রতা ধরে রাখে। মাটির উপরিভাগ সর্বদা ৫ সে.মি. জাবড়া দ্বারা আবৃত থাকলে জমি কর্ষণের প্রয়োজন হয় না।

উর্বরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়

জাবড়া ক্রমান্বয়ে বিয়েঅজিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়।

ছিটিয়ে বীজ বপনের ক্ষেত্রে জাবড়া সমস্যা সৃষ্টি করে। বীজ বপনের পর স্বল্প পরিমান জাবড়া প্রয়োগে কোন সমস্যা দেখা দেয় না; কিন্তু বেশী পরিমাণ জাবড়া প্রয়োগের পর বীজ বপন করলে অংকুরোদগমের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়। জাবড়ার ঘনত্ব এবং বীজ বপনের সময়কে নিয়ন্ত্রণে রেখে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। চারা রোপণ কিংবা রোপিত চারার জন্য জাবড়া কোন সমস্যা নয়।

৫.২.৩ জাবড়ার উপকরণ

পাতা, ঘাস, ফসলের অবশিষ্টাংশ, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি সহ যে কোন জৈব পদার্থ জাবড়া হিসাবে ব্যবহার করা যায়। প্রশিকার নিজস্ব খামারে আগাছা, লেবুঘাস, নারকেল পাতা, ঘড়, কুরীপানা, বহুমখী ব্যবহারের উপযোগী গাছের পাতা এবং কম্পোষ্ট জাবড়ার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ক্ষেত্র বিশেষে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন এবং উপকরণের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে জাবড়ার উপকরণ নির্বাচন করা উচিত। বর্ষা মৌসুমে মাটি সংরক্ষণ করতে এবং ছত্রাকজনিত সমস্যা এড়ানোর জন্য উচ্চ কার্বন/নাইট্রোজেন অনুপাতের (বেশী কার্বন) উপকরণ (৬০এর চেয়ে বেশী) লেবুঘাস, খড়, নারকেল পাতা ইত্যাদি জাবড়া হিসাবে ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। উচ্চ কার্বন/নাইট্রোজেন অনুপারেত জাবড়া বিয়োজিত হতে দীর্ঘ সময়ের দরকার এবং এগুলোর উপস্থিতিতে সহজে ছত্রাকের প্রাদুর্ভাব ঘটে না। মাটির উর্বরতাবিধানের উদ্দেশ্যে কম কার্বন/নাইট্রোজেন অনুপাতের উপরকণ (বেশী নাইট্রোজেন) প্রয়োগ করা উচিত (যেমন: লিগিউম জাতীয ফসলের অবশিষ্টাংশ ও ঘাস, লিগিউম জাতীয় উদ্ভিদের পাতা, কম্পোষ্ট ইত্যাদি)।

জীবন্ত জাবড়া

স্বল্প উচ্চতাসম্পন্ন এবং আনুভূমিকভাবে শাখা প্রশাকা বিস্তারে সক্ষম লিগিউম জাতীয় ঘাস জন্মিয়ে মাটি আচ্ছাদিত রাখাকে জীবন্ত জাবড়া বলে। জাবড়ার উপকরণ সংগ্রহে সমস্যা হলে কিংবা ফসলের ভিতর জাবড়া প্রয়োগের প্রয়োজন হলে জীবন্ত জাবড়া খুবই উপযোগী। জীবন্ত জাবড়া ব্যহারের সুবিধা হ'ল:-

১. পৃথকভাবে উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না
২. মাটি সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর পদ্ধতি
৩. ব্যবহৃত লিগিউম জাতীয় ঘাস মূল ফসলের জন্য নাইট্রোজেন যোগান দেয়।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে জীবন্ত জাবড়া হিসাবে ক্লোভার ব্যবহার করা হয় (ফুকুয়োকা তার ধান ক্ষেত ও ফলের বাগানে ক্লোভার ব্যবহার করেন)। বাংলাদেশে শীত মৌসুমের জন্য এ কাজে খেসারী ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫.২.৫ আচ্ছাদন ফসল

আচ্ছাদন ফসল হল এক ধরনের জীবন্ত জাবড়া। গ্রষ্মের তপ্ত ও খরার দিনগুলিতে যখন জমি আনাবাদি থাকে তখন আচ্ছাদন ফসলের লতাপাতা দ্বারা জমি আবৃত রাখা হয়। এর সুবিধা হ'ল:-

১. বাস্পীভবন রোধ করে এবং আর্দ্রতা ধরে রাখে
২. সৌর শক্তি কাজে লাগিয়ে বায়োমাস উৎপাদন করে।
৩. আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাখে

আচ্ছাদন ফসলের বৈশিষ্ট্য

১. লিগিউম জাতীয় ফসল
২. বেশী জায়গা আচ্ছাদিত রাখতে পারে।
৩. তাপপ্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন

গ্রীস্মকালে এদেশের জন্য আচ্ছাদন ফসল হিসাবে সীম খুবই কার্যকর। আচ্ছাদন ফসল হিসাবে ভেলভেট সীম সর্বোত্তম। এটি বাংলাদেশে সচরাচর দেখা যায় না। (প্রশিকার নিজস্ব খামারে ভেলভেট সীমের বীজ পাওয়া যায়)।

৫.৩ সবুজ সার

লিগিউম জাতীয় ফসল- ১-২ মাস জন্মানোর পর উৎপান্ন সবটুকু বায়োমাস জৈব সার হিসাবে মাটিতে ফেরত দিলে এরূপ সারকে সবুজ সার বলে।

৫.৩.১ সবুজসার ব্যবহারে সুবিধা

জৈবপদার্থ সরবরাহ

কেন চাষীরা জমিতে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ সরবরাহ করতে পারে না? করণ একটাই- জৈবপদার্থের স্বল্পতা। সাধারণত: বছরে একর প্রতি ৮-১০ টন জৈবপদার্থ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই বিশাল পরিমাণ জৈবপদার্থ যেমন সহজপ্রাপ্য নয়, তেমনই সংগ্রহ করাও কষ্টকর। সবুজ সার একাধারে জমির জন্য প্রয়োজনীয় জৈবপদার্থ সরবরাহ করে আবার বাহির থেকে জৈবপদার্থ সংগ্রহের মতন কষ্টকর কাজ কমায়।

মাটির গুণগত মান উন্নত করে

সবুজ সার একবারে মাটিতে যে বিপুল পরিমাণ জৈবপদার্থ সরবরাহ করে, তা এত সহজে অন্য কোন পদ্ধতিতে সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এর ফলে মাটির গুণ চমকপদভাবে বেড়ে যায়। প্রথমত: জৈবপদার্থ মাটি নরম রাখে এবং পানি-ধারণক্ষমতা ও নিকাশগুণ বৃদ্ধি করে বলে মাটির গঠন উন্নত হয়। দ্বিতীয়ত: সবুজ সার হিসাবে লিগিউম জাতীয় ফসল ব্যবহার করা হলে মাটিতে নাইট্রোজেনের গ্রহণোপযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং অন্যাণ্য রাসায়নিক গুণের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত: অণুজীবদের সংখ্যা ও কার্যকরতা বৃদ্ধি পায়। মাটিতে জৈবপদার্থের প্রাচুর্য নিমাটোডের সংখ্যা সীমিত রাখে। (জৈব পদার্থ ছত্রাকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে- ফলে নিমাটোডের সংখ্যা কমে যায়)।

শ্রম এবং খরচ তুলনামূলকভাবে কম

এ কাজের জন্য শুধুমাত্র ছিটিয়ে বীজ বোনা এবং পরবর্তীকালে চাষ দিয়ে মাটিতে মেশাতে শ্রমের প্রয়োজন হয়। সবুজ সার জন্মাতে একর প্রতি মাত্র ২০-৩০ কেজি বীজই যথেষ্ট। এজন্য মাত্র ২০০-৩০০ টাকার প্রয়োজন।

৫.৩.২ সবুজ সার ব্যবহারে সমস্যা

পেবশী সময়ের প্রয়োজন

অনেক উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও, কৃষকরা সবুজ সার ব্যবহার অনুশীলনে তেমন আগ্রহী নয়। কারণ সবুজ সার জন্মানোর সময় উক্ত জমিতে অন্য কোন ফসল

আবাদ সম্ভব নয় (১.৫-২ মাস সবুজ সার জন্মানোর জন্য এবং ২ সপ্তাহ পচনের জন্য)। সুতরাং এজন্য এমন একটি শস্যচাষ-নমুনা উদ্ভাবনের প্রয়োজন, যেখানে সবুজ সার জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যাবে। সবুজ সার জাবড়া প্রয়োগের অনুশীলনে কিছু সময় বাঁচানো সম্ভব। সবুজ সার মাটিতে মেশানো হয় না, শুধুমাত্র কেটে মাটির উপরে বিছানো হয়। সুতরাং পচনের জন্য প্রয়োজনীয় ২-৩ সপ্তাহ সময় বেঁচে যায়।

সবুজ সার ব্যবহারে ঝুঁকি

সবুজ সার মাটিতে মেশানোর পর বিয়োজনের জন্য যথেষ্ট সময় অপেক্ষা না করে

বীজ বপন কিংবা চারা রোপণ করলে, গাছ সঠিকভাবে বৃদ্ধি পায় না। কারণ, সবুজসার বিয়োজনের সময় যে ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন করে তা গাছের শিকড়ের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। এ গ্যাস শাক-সবজির জন্য খুবই ক্ষতিকর- তবে দানা ফসলের জন্য কম ক্ষতিকর। বিয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা একটু কঠিন কাজ। কারণ, ফসলের প্রকৃতি আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল; সঠিকমাত্রার আর্দ্রতা এবং উচ্চ তাপমাত্রা বিয়োজনের সময় কমিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে কৃষককে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়। তবে, ২-৩ সপ্তাহ সময় বিয়োজনের জন্য যথেষ্ট।

৫.৩.৩ সবুজ সারের জন্য উপযোগী ফসল

সবুজ সারের জন্য উপযোগী ফসলের বৈশিষ্ট্য হ'ল:

১. দ্রুত বর্ধনশীল, স্বল্প সময়ে বেশী পরিমাণ বায়োমাস উৎপাদন করা যায়
২. লিগিউম জাতীয় ফসল- যারা তাদের শিকড়ে নাইট্রোজেন সংযোজনকারী ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন সংযোজন করতে পারে।

প্রশিকার নিজস্ব খামারে সবুজ সার হিসাবে প্রধানতঃ মাসকালাই, মুগ, ধৈঞ্চা, শনপাট ও খেসারী ব্যবহার করা হয়। ভূট্টা কিংবা সরগম সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের দানা ফসল সবুজ সার হিসাবে ব্যবহৃত হলে মাটিতে প্রচুর জৈবপদার্থ যোগ হয় এবং মাটিবাহিত রোগ নিরাময় হয়।

৫.৩.৪ সবুজ সার জাবড়া

সবুজ সার থেকে এটি একটু ভিন্ন ধরনের। এ পদ্ধতিতে সবুজ সার ফসল কেটে মাটির উপরে জাবড়ার মতন ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতির সুবিধা হ'লঃ

১. পচনের সময় কমায়
২. মাটি সংরক্ষণ করে
৩. কর্ষণের সময় শ্রম কমায়
৪. ৮৯-৯০ মৌসুমে প্রশিকার নিজস্ব খামারে মাসকালাই দ্বারা সবুজ সার জাবড়া প্রয়োগ করে ফুলকপি ও বাঁধাকপির উল্লেখযোগ্য ভাল ফলন পাওয়া গেছে।

৫.৪ কম্পোষ্ট

মাটির উর্বরশক্তি বৃদ্ধির জন্য কম্পোষ্টের ব্যবহার সবচেয়ে জনিপ্রিয়। কম্পোষ্ট তৈরীর প্রক্রিয়ায় বিবিধ উৎস থেকে সংগৃহীত জৈবপদার্থ (উচ্চ C/N অনুপাতের, কম C/N অনুপাতের, শুকনো ও তাজা জৈবপদার্থ, গোবর, ঘাস, মাটি ইত্যাদি) একত্রে মিশানোর পর পচনের জন্য রেখে দেয়া হয় এবং সম্পূর্ণ পচনের পর সরাসরি জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কম্পোষ্ট তৈরীর উদ্দেশ্য হল তাজা জৈব পদার্থের বিয়োজন ঘটিয়ে হিউমাস তৈরী করা-যা মাটির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং ফসলের জন্য মোটেই ক্ষতিকর নয়।

৫.৪.১ কম্পোষ্ট ব্যবহারের সুবিধা

দ্রুত কার্যকর

জাবড়া কিংবা সবুজ সারের তুলনায় কম্পোষ্ট তাড়াতাড়ি কাজ করে। কম্পেষ্ট কার্যকর হ'তে মোটামুটি ১০দিনের মতন সময় লাগে। কম্পোষ্ট তৈরীর প্রক্রিয়ায় জৈব পদাার্থসমূহ বিয়োজিত হয়ে (২-৩ মাসের মধ্যে) গাছের গ্রহণোপযোগী হিউমাস ও খনিজের পরিণত হয়।

সুষম সার

সুবিয়োজিত কম্পোষ্ট সুষম সার এবং ইহা মাটিকে শস্য উৎপাদনের উপযোগী করে গড়ে তেলে। মাটিতে প্রয়োগের পূর্বেই জৈব পদার্থ সমূহের মিশ্রণ পরিপূর্ণভাবে

বিভিন্ন লিগিউম উদ্ভিদ দ্বারা সংযুক্ত নাইট্রোজেনের পরিমাণ

উদ্ভিদের নাম	নাইট্রোজেন সংযোজনকারী ব্যাকটেরিয়া	পরিমাণ (কেজি/হে/বৎসর)
ধৈঞ্চা	রাইজোরিয়াম	৫২৪
চীনাবাদাম	রাইজোরিয়াম	১৭২ থেকে ২৪০
ছোলা	রাইজোরিয়াম	১০০ থেকে ১৪০
সোয়াবিন	রাইজোরিয়াম	৫০ থেকে ১৫০
সীম	রাইজোরিয়াম	৫০ থেকে ১২৫
মটরশুটি	রাইজোরিয়াম	৩০ থেকে ১০০

by Buckman and Brady 1984 (Natural Property of Soil)

বিয়োজিত হয় বলে, কম্পোষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমেই তাজা জৈব পদার্থ মাটিতে প্রয়োগ এড়ানো সম্ভব। তাজা জৈব পদার্থ গাছের জন্য ক্ষতিকর এবং ইহা রোগ পোকা জনিত সমস্যা সৃষ্টি করে। (৫.১)

কম্পোষ্ট তৈরীতে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করা হয়

যে কোন জৈব পদার্থ ব্যবহার করে কম্পোষ্ট তৈরী করা যায়। এমন কি আবর্জনার মত যে সমস্ত জৈব পদার্থ সরাসরি মাটিতে ব্যবহার করা যায় না তা-ও কম্পোষ্ট তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। কম্পোষ্ট তৈরীর পদ্ধতিতে, স্থানীয়ভাবে সহজেলভ্য উপকরণের ব্যবহার উৎসাহিত করা হয়। যেমনঃ কচুরী পানা- যা বাংলাদেশের

বিভিন্ন লিগিউম উদ্ভিদ দ্বারা সংযুক্ত নাইট্রোজেনের পরিমাণ

নাম	বপন কাল	বীজ হার/একর
ধৈঞ্চা (Sesbania) Sesbania aculata	এপ্রিল-আগষ্ট	২৫ কেজি
মাসকালাই (Black gram) Phaseolus mungo	মার্চ-অক্টোবর	৩০ কেজি
শনপাট (Sunhemp) Crotalaria juncea	মার্চ-জুন	৩০ কেজি
মুগডাল (Mung bean) Phaseolus radiatus	মার্চ-সেপ্টেম্বর	৩০ কেজি
গো-শিম (Cow pea) Vigna tunguiculara	মার্চ-সেপ্টেম্বর	৩৫ কেজি
জ্যাক বিন (Jack bean) canavalia ensiformis	এপ্রিল-সেপ্টেম্বর	৪০ কেজি
খেসারী (Grass pea) Lathyrus sativus	অক্টোবর-ডিসেম্বর	৩০ কেজি
মটরশুঁটি (Sweet pea) Pisum sativum	অক্টোবর-ডিসেম্বর	৩০ কেজি
মসুর (Lentil) Lens culinaris	নভেম্বর-ডিসেম্বর	২৫ কেজি
বাকলা কলাই (Faba bean) Vicia faba	অক্টোবর-নভেম্বর	৪০ কেজি
নীল (Indigofera) Indigofera sumatrana	অক্টোবর-নভেম্বর	১৫ কেজি
পাট (Jute) Corchoras spp	এপ্রিল-জুন	২০ কেজি
শিম (Lablab bean) Dalichos lablab	মে-জানুয়ারী	১০ কেজি
ভেলভেট শিম (Velvet bean) Mucana pruciens)	এপ্রিল-অক্টোবর	১০ কেজি

সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অধিকাংশ কৃষক কচুরী পানাকে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে এবং জমি থেকে সরানোর জন্য প্রচুর শ্রম অপচয় করে। যদি তারা বুঝতে পারতো যে কচুরি পানা জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ এবং কম্পোষ্টের উৎকৃষ্ট উপরকণ এবং কৃষির জন্য কম্পোষ্ট খবই উপকারী, তাহলে কচুরীপানার ব্যবহার নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করত।

৫.৪.২ কম্পোষ্ট ব্যবহারের সমস্যা

প্রতি বছর একর প্রতি ৮ টন জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এত জৈব পদার্থ সংগ্রহ করা বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কারণ, এদেশে জৈব পদার্থ রান্নার জ্বালানী সহ অন্যান্য বহু কাজে ব্যবহৃত হয়। এ সমস্যার সমাধানকল্পে জ্বালানীর বিকল্প খোঁজা উচিত (বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী গাছ লাগানো) এবং মাটির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর জন্য কম্পোষ্ট ব্যবহারের সাথে অন্যান্য পদ্ধতি অনুশীলন করা উচিত। (সবুজ সার, জাবড়া ইত্যাদি)।

পুষ্টি- উপাদানের অপচয়

কম্পোষ্ট তৈরীর প্রক্রিয়া চলাকালীন সূর্যের তাপ, বৃষ্টিপাত ও বাতাসের প্রভাবে কতক পুষ্টি-উপাদানের অপচয় হয়। এই অপচয় বোধের জন্য নিম্নে বর্ণিত বিষয়াবলী বিবেচনায় রাখা উচিত:

১. স্থান নির্বাচন (গাছের ছায়ায় অথবা চালের নিচে)

২. সময়মত স্তুপ তৈরী, সময়মত উল্টানো এবং তিন মাসের মধ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা ইত্যাদি প্রক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন করা।

কষ্টসাধ্য কাজ

উপকরণ সংগ্রহ, কম্পোষ্ট তৈরী, স্তুপ উল্টানো, জমিতে প্রয়োগ ইত্যাদি কাগুলো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। সুতরাং বেশীরভাগ জৈব পদার্থ জাবড়া হিসাবে প্রয়োগ করে, জাবড়ার অনুপযোগী উপরণগুলিদ্বারা কম্পোষ্ট তৈরী করা উত্তম।

৫.৪.৩ কম্পোষ্ট তৈরীর প্রক্রিয়া

ভাল কম্পোষ্ট তৈরীর জন্য নিম্ন লিখিত বিাষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ:

শুকনো ও তাজা উপকরণ মাটি সহ মিশ্রিত করা

সুষ্ঠুভাবে বিয়োজন ঘটানোর জন্য অণুজীবের উপস্থিতি অপরিহার্য। কম্পোষ্ট স্তুপে অণুজীবদের সংখ্যা র্বদ্ধি করতে তাজা ও শুকনো উপকরণের সাথে মাটি মেশানো হয়। ব্যাকটেরিয়া প্রধানতঃ বিয়োজন প্রক্রিয়া সম্পাদন করে। এদের কার্যকরতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত বাতাস ও পানির প্রয়োজন হয়। কম্পোষ্ট তৈরীর জন্য তাজা উপাদান, শুকনো উপাদান ও মাটির উত্তম অনুপাত হ'ল ৬ শুকনো উপাদান: ৩ তাজা উপাদন: ১ মাটি। শুকনো উপাদনে পানির পরিমাণ কম থাকে কিন্তু এগুলো উচ্চ C/N অনুপাতসম্পন্ন বলে এদের বিয়োজন ধীরগতিসম্পন্ন। যেমন: ধানের খড়, অন্যান্য ফসলের অবশিষ্টাংশ, শুকনো কচুরী পানা, কাঠের গুঁড়া, শুকনো পাতা ইত্যাদি। তাজা উপাদানগুলিতে পানির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশী; কিন্তু C/N অনুপাত কম বলে দ্রুত বিয়োজিত হয়ে যায়। যেমন: গোবর, অন্যান্য পশুর বিষ্ঠা, রান্না ঘরের আবার্জনা, লিগিউম জাতীয় ঘাস এবং লিগিউম জাতীয় উদ্ভিদের পাতা।

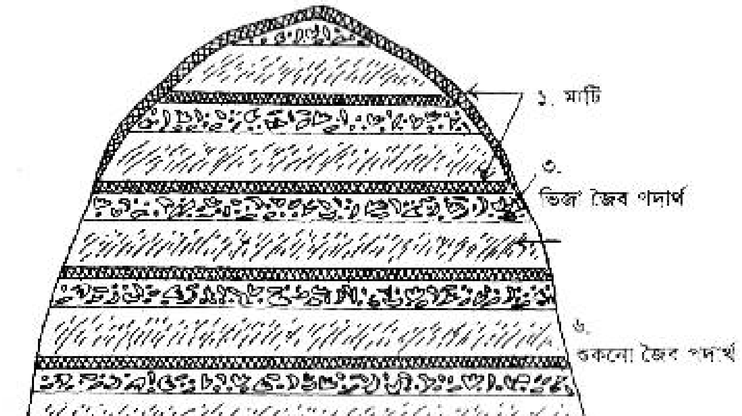

সুষম উপাদান

সকল প্রকার জৈব পদার্থে কার্বন-নাইট্রোজেনের অনুপাত সুনির্দিষ্ট। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে: খড়ের C/N অনুপাত ৬০ এবং গোবরের ২৫। সে সমস্ত উপকরণের C/N অনুপাত কম সেগুলোর তুলনায় বেশী C/N অনুপাতসম্পন্ন

উপকরণ ধীরে ধীরে বিয়োজিত হয়। এজন্য উভয় প্রকার উপকরণ মিশিয়ে কম্পোষ্ট তৈরী করতে হয়। মিশ্রিত জৈব পদার্থের C/N অনুপাত যখন মোটামুটি ৪০ হয় তখন অণুজীবেরা বিয়োজন ক্রিয়া ঘটানোর কাজে সবচেয়ে বেশী সক্রিয় থাকে। (যেমন: সমপরিমাণ খড় ও গোবরের মিশ্রণ)।

প্রতি তিন সপ্তাহে দুবার কম্পোষ্ট স্তূপ উল্টানো

আদর্শ কম্পোষ্ট তৈরীর লক্ষ্যে অণুজীবদের কার্যকরতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করতে প্রতি তিন সপ্তাহে দুর্বার করে কম্পোষ্ট স্তূপ উল্টানো প্রয়োজন। এতে করে কোন কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজনে পর্যবেক্ষণের কাজটিও সমাধান করা যায়।

আদর্শ কম্পোষ্ট সুঘ্রাণ সম্পন্ন, রং কালচে বাদামী এবং সবটুকুই অভিন্ন। প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে, যে সকল উপাদন দ্বারা কম্পোষ্ট তৈরী হয় সে সকল উপাদানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

৫.৫ খামারের সীমানা বরাবর গাছ ও ঘাস লাগানো

পরিবেশসম্মত কৃষির জন্য খামারের বাউণ্ডারী ব্যবহার অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষক সচরাচর সীমানাকে সম্পদের উৎস হিসাবে ভাবতে চায় না। কিন্তু সীমানা বরাবর স্থায়ী গাছ ও ঘাস লাগানো হলে তা একটি কার্যকর ও উৎপাদনশী এলাকায় পরিণত হতে পারে।

৫.৫.১ সীমানা বরাবর গাছ ও ঘাস লাগানোর উপকারিতা

মাটির ক্ষয় রোধ করে কম্পোষ্টের উপযুক্ত সাইজ ৫ x ৫ x ৫

বাংলাদেশে ভূমিক্ষয়ের মুল কারণ বর্ষা মৌসুমের প্রবল বৃষ্টিপাত এবং অনাবৃত মাটি। জমির সীমানা সুরক্ষিত না থকলে প্রবল বৃষ্টিপাতের পলে মাটির উপরের স্তর ধুয়ে যায় এবং কখনও কখনও সীমানায় ভাঙ্গন ধরিয়ে দেয়। সীমানায় স্থায়ী গাছ ও ঘাস লাগিয়ে এ ধরনের সমস্যা সমাধান করা যায়।

গাছ ও ঘাসের শিকড় মাটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। এতে সীমানার ভাঙন এবং ভূমিক্ষয় রোধ হয়। প্রশিকার নিজস্ব খামারে, ১৯৮৮ সালের দিকে ভূমিক্ষয়

জনিত সমস্যাটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বহুবার সীমানা ভেঙ্গেছে এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে তা সংস্কার করা হয়েছে। সীমানা বরাবর স্থায়ী ঘাস ও গাছ লাগানোর পর এক বছরের মধ্যেই এ সমস্যার অবসান ঘটেছে।

বায়ু প্রতিরোধ করে

বাংলাদেশের বর্ষা মৌসুমের শুরুতে ঘুর্ণিঝড়ের ফলে ফসলের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। সীমানা বরাবার লাগানো গাছ বায়ু-প্রতিরোধী হিসাবে কাজ করে এবং প্রবল বাতাসের হাত থেকে ফসল রক্ষা করে।

জৈব পদার্থ উৎপাদন করে

সচরাচর কোন কিছু উৎপাদনের জন্য সীমানা এলাকা ব্যবহার করা হয় না। সীমানা বরাবর স্থায়ী গাছ ও ঘাস লাগিয়ে সীমানাকে জৈব পর্দাার্থ উৎপাদনের উৎসে পরিণত করা যায় এবং তা থেকে প্রাপ্ত জৈব পদার্থ জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। স্থায়ী গাছ সারা বছর ধরে সূর্যের আলো এবং মাটির গভীরের পুষ্টি-উপাদান ব্যবহার করে যে বিপুল পরিমাণ জৈব পদার্থ উৎপাদন করতে পারে, বর্ষজীবী ফসল তা পারে না।

গো-খাদ্য উৎপাদন করে

লিগিউম জাতীয় উদ্ভিদের পাতা এবং নেপিয়ার, পারা ইত্যাদি ঘাস উত্তম গো খাদ্য। বাংলাদেশে গো-খাদ্যের সমস্যা ব্যাপক। সীমানা বরাবর গাছ ও ঘাস লাগিয়ে এ সমস্যার কতকটা সমাধান করা যেতে পারে।

জ্বালানি উৎপাদন করে

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে জ্বলানির সমস্যা প্রকট। গ্রামঞ্চলের মানুষেরা যে কোন জৈব পদার্থ জমির উর্বরতা বিধানের জন্য ব্যবহার না করে বরং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে। গাছের ডালপালা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে এ সংকট কমানো যায়। সীমানা বরাবর ২ ফুট দূরে দূরে ৩৬৫ টি ইপিল-ইপিল কিংবা জয়ন্তি গাছ লাগানো হলে, এক বছরের মধ্যেই তা থেকে একটি পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি পাওয়া যায়। এজন্য সীমানার পরিধি ৭০০ ফুট হওয়া উচিত- যা দুই বিঘা

জমির সর্বনিম্ন পরিধির সীমানা।

বৈচিত্র্য বাড়ায়:
উক্ত সরাসরি প্রাপ্ত সুবিধাগুলি ছাড়াও সীমানার গাছ পরোক্ষভাবে খামারের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করে। বিভিন্ন প্রকারের স্থায়ী গাছ ও ঘাস বৈচিত্র বাড়ায় এবং অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থল হিসাবে কাজ করে। এ সকল প্রাণী ক্ষতিকর কীট পতঙ্গদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। এইজৈব বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

৫.৫.২ সীমানা বরাবর রোপিত গাছের সমস্যা ছায়া সৃষ্টি করে

ছায়া সৃষ্টি করে বলে কৃষক সীমানা বরাবর গাছ লাগাতে চায় না। এ সমস্যাটি দু'ভাবে সমাদান করা যেতে পারে। প্রথমত: গাছের নীচে ছায়াসহিষ্ণু ফসল আবাদ করে; দ্বিতীয়ত: সীমানা বরাবর সেই সমস্ত গাছ লাগানো, যাদেরকে বছরে কয়েকবার কেটে সীমার মধ্যে রাখা যায়।

দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া
জমির চারিধারে গাছ ও ঘাস লাগনোর উপকারিতার কথা কৃষকদের জানা তাকরৌ তারা এর অনুশীলন করতে তেমন আগ্রহী নয়। কারণ, এভাবে লাগানো গাছ ও ঘাস প্রয়োজন মত বাড়তে কমপক্ষে ১-২ বছর সময় লাগে। তাছাড়া, এর থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদি প্রত্যক্ষ নয় বরং পরোক্ষ-যা অনেক সময় কৃষকদের পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন। সুতরাং, এর অনুশীলন প্রদর্শনের মাধ্যমে কৃষকদের সচেতন করা আবশ্যক।

৫.৫.৩ বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী গাছ

সচারাচর কোন চাষী তার খামারের আশেপাশে যেকোন ধরনের স্থায়ী গাছ লাগাতে নারাজ। কারণ তাদের ধারণা ছায়া ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। এব্যাপারে কৃষকেদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হ'ল খামারের সীমানা বরাবর বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী গাছ লগানো। বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী গাছকে বেশী বড় হবার সুযোগ দেয়া হয় না। ফলে, এরা বেশী জায়গা আচ্ছাদিত করে রাখতে পারে না। এদের বার বার কেটে সীমিত পরিসরে রাখা হয়। বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী

অধিকাংশ গাছ দ্রুত বর্ধনশীল। লিগিউম জাতীয় এসকল গাছ থেকে পূর্বে বর্ণিত সকল সুবিধা পাওয়া যায়।

প্রশিকার নিজস্ব খামারের সীমানা বরাবর এবং আইলের উপর ইপিল ইপিল, মাদ্রী, মাছি, জয়ন্তি, বকফুল, বগাডোলা প্রভৃতি লিগিউমজাতীয় গাছ লাগানো হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে এক ধরনের গাছের চেয়ে বিভিন্ন রকমের গাছ লাগানো উত্তম।

রেফারেন্স হিসাবে এ বইয়ের শেষের দিকে বিভিন্ন গাছের কয়েকটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে।

সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বস্তুই প্রকৃত বস্তু নয়।

মাসানোবু ফুকোয়োকা
(তৃনখণ্ড বিপ্লব)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শস্য চাষ পদ্ধতি

বর্তমান কৃষির শস্য চাষ পদ্ধতিতে একক ফসলের আবাদ ও একই ফসলের লাগাতার চাষ ব্যাপককভাবে অনুশীলন করা হয়। পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে এ পদ্ধতি দুটি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এরূপ শস্য চাষ পদ্ধতি অনুশীলনের ফলে পুষ্টি-উপাদানের ঘাটতি ও রোগ পোকার প্রাদুর্ভাব সহ বহু সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এগুলো অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। এ সমস্যাগুলো সমাধান করতে একটি বিকল্প শস্য চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন প্রয়োজন।

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়:

বর্তমান শস্য চাষ পদ্ধতির সমস্যা

১. একক ফসলের আবাদ

⇒ একই ফসলের লাগাতার আবাদ

বিকল্প চাষ পদ্ধতি

২. বিচিত্র ফসলের আবাদ

⇒ শস্য পর্যায়

⇒ মিশ্র ফসলের আবাদ

৬.১ বর্তমান শস্য চাষ পদ্ধতি অনুশীলনে সৃষ্ট সমস্যা

৬.১.১ একক ফসলের আবাদ

"একটি মাত্র ফসলের আবাদ করা" আজকাল কৃষিকাজ অনুশীলনে মানুষের সাধারণ প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র আর্থিকভাবে লাভজনক এমন একটি গুটিকয়েক ফসলের আবাদ করা। আগের দিনের কৃষক কখনও একক ফসলের আবাদ করতো না। কারণ, তারা জানতো এর ফলে রোগ পোকার একক ফসলের আবাদ করতো না। কারণ, তারা জানতো এর ফলে রোগ পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং এ কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। রাসায়নিক সার ও বিষয়ের ব্যবহার একক ফসল আবাদের জন্য সাময়িকভাবে দ্রুত কার্যকর বলে কৃষক সাধারণত একক ফসলের আবাদে আগ্রহী হয়। ইহা ছাড়াও উফশী জাতের বীজ প্রবর্তনের ফলে ধান চাষের ক্ষেত্রে একক ফসলের আবাদ ত্বরান্বিত হয়েছে। এর ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো নিম্নরূপঃ

রোগ পোকার প্রাদুর্ভাব বেড়েছে

একটি ফসল কোন একটি বিশেষ রোগ বা পোকার আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হতে পারে। ১৯৯০ সালে মানিকগঞ্জ এলাকার সব আমড়া বাগান পোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আক্রান্ত সব আমড়া গাছের পাতা পোকায় খেয়ে ফেলে। আমড়া পাতা নিঃশেষ হবার পর পোকারা দল বেঁধে অন্য সব গাছের পাতা খাওয়ার চেষ্টা করে এবং বিফল হয়। সর্বশেষে (আমড়া গাছ ছাড়া) অন্য কোন গাছের ক্ষতি না করে পোকারা বাগান ছেড়ে চলে যায়। প্রত্যেক ধরনের পোকার নিজস্ব খাদ্যাভ্যাস আছে। এক্ষেত্রে প্রশিকার ফলবাগানের যদি শুধুমাত্র আমড়া গাছ থাকতো তাহলে সম্পূর্ণ বাগানটা ধ্বংস হয়ে যেতো। সৌভাগ্যবশতঃ প্রশিকার ফলবাগানটি রক্ষা পেয়েছিল, কারণ এটি একটি মিশ্র ফলের বাগান। এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, একক ফসল সহজেই পোকাদ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটার অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে।

জিনেটিক রিসোর্স (স্থানীয় জাতসমূহ) হারিয়ে যাচ্ছে

কৃষকদের মাঝে "উফশী" ও সংকর জাতের বীজ প্রবর্তন করা হয়েছে। এ সমস্ত বীজ ব্যবহার করার জন্যই কৃষক স্থানীয় জাতের বীজ ব্যবহার করে না। স্থানীয় জাতের বীজ বৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ভবিষ্যতের জন্য জিনেটিক সম্পদ হিসাবে কাজ করে।

আর্থিক ঝুঁকি

মাত্র একটি ফসলের আবাদ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। রোগ, পোকা কিংবা আবহাওয়াজনিত কারণে ফসলটি ক্ষতিগ্রস্থ হলে সম্পূর্ণরূপে খামারটিই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি উৎপাদন ভাল হলেও বাজারে সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় দাম কমে যায়। এ সমস্ত কারণেই একক ফসল চাষের অনুশীলন কখনও কৃষকের জন্য আর্থিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে না।

৬.১.২ লাগাতার একই ফসলের আবাদ

কোন জমিতে প্রতিবছর একই ফসল চাষ করাকে কিংবা সুনির্দিষ্ট কোন মৌসুমে একই ফসল চাষ করাকে লাগাতার আবাদ বলে। যেমনঃ কোন জমিতে প্রতি শীত মৌসুমে বাঁধাকপি চাষ করা। এর ফলে সৃষ্টি সমস্যাগুলো হলঃ

সুনির্দিষ্ট (অণু) পুষ্টি-উপাদানের ঘাটতিঃ

বাংলাদেশে ধানের জমিতে দস্তা ও সালফারের ঘাটতি অণুপুষ্টি-উপাদানের ঘাটতির উদাহরণ। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল একই জমিতে লাগাতার ধানের আবাদ। লাগাতার ধান আবাদের ফলে, ধানগাছ লাগাতারভাবেই তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি-উপাদান গ্রহণ করে, কিন্তু রাসায়নিক সার অল্প কয়েকটি মাত্র উপাদান সরবরাহ করে (যেমন N.P.K)। এমতাবস্থায়, মাটিতে যেসমস্ত উপাদানের ঘাটতি বিদ্যমান সেসমস্ত উপাদান কৃত্রিমভাবে সরবরাহ করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন শস্যাবর্তন (Crop rotation) ও মাটিতে জৈব পদার্থের সরবরাহ।

বিশেষ রোগ

অণুজৈবিক কার্যাবলীর বিচারে, উদ্ভিদের শিকড় পরিবেষ্টিত এলাকাটি অন্য সকল এলাকা থেকে ভিন্ন ধরনের। শিকড় থেকে বিভিন্ন দ্রব্য ক্ষরণ হয় বলে অণুজীবেরা এই এলাকায় বেশী সক্রিয় থাকে। প্রত্যেক ধরনের উদ্ভিদ তাদের শিকড়-পরিবেষ্টিত অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট অণুজীবদের জন্য অনুপম অবস্থা সৃষ্টি করে রাখে। উদাহরণ স্বরূপ, টমেটোর শিকড়-পরিবেষ্টিত অঞ্চল নিমাটোড বিস্তারের জন্য উপযোগী (দানা ফসলের ক্ষেত্রে এ রূপ ঘটে না)। সুতরাং, কোন জমিতে লাগাতার একই ফসলের আবাদ করা হলে কোন নির্দিষ্ট অণুজীবের প্রাদুর্ভাব ঘটার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং ফসলটিতে উক্ত অণুজীবঘটিত রোগ দেখা দেয়।

অণুজীবের সংখ্যা
টমেটোর লাগাতার ও পর্যায়ক্রমিক আবাদ

অণুজীব	লাগাতার চাষ	পর্যায়ক্রমিক চাষ
ছত্রাক (F)	২.১×১০^{৪} (৪.৪×১০^{৫})	১.৩×১০^{৩} (৯.০×১০^{২})
ব্যাকটেরিয়া (B)	১.৮×১০^{৬} (১.৮×১০^{৭})	৬.৮×১০^{৫} (১.৯×১০^{৭})
নিমাটোড	২৫(২৮)	০(০)
B/F অনুপাত	৮৫.৭ (৪০.৯)	৫২৩ (২১১১১)

(   ) চারা রোপণের ১ মাস পর
সূত্র: এম. কোব্বাইয়াশি রচিত "জৈব পদার্থ ও অণুজীব"

৬.২ বিকল্প শস্য চাষ পদ্ধতি

রোগ পোকার প্রাদুর্ভাব জনিত সমস্যা সমাধান ও নির্দিষ্ট পুষ্টি-উপাদানের ঘাটতি রোধের জন্য একটি বিকল্প শস্য চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অবশ্যই একক ফসলের আবাদ বর্জন করে বিকল্পের সন্ধান করতে হবে। ঐতিহ্যগতভাবে অনুসৃত স্থানীয় শস্য চাষ পদ্ধতিতে এর যথেষ্ট নমুনা পাওয়া যাবে। নিম্নলিখিত বিষয়াবলী বিকল্প শস্য চাষ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত:

১. বিচিত্র ফসলের চাষ
২. শস্য পর্যায়/শস্যাবর্তন
৩. মিশ্র ফসলের আবাদ।

বিকল্প শস্য চাষ পদ্ধতি বাস্তবে অনুশীলন করার জন্য কৃষকদের ফসলের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে সব ফসলেরই শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ কৃষকদের পক্ষে বুঝতে পারা খুবই কঠিন। ফসলের আকৃতি ও আকারের উপর নির্ভর করে শ্রেণীবিন্যাস কৃষকদের জন্য সহজবোধ্য হবে।

ফসলের বিকল্প শ্রেণীবিন্যাস

দানা ফসল	:	ধান পরিবারে অন্তর্ভুক্ত ফসলঃ ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি।
লিগিউম/ডাল জাতীয় ফসল	:	শিম পরিবারর্ভুক্ত ফসলঃ দেশী শিম, মাসকালাই, খেসারী, বরবটি ইত্যাদি।
পাতা ফসল	:	পাতা ও কচি অবস্থায় সম্পূর্ণ ফসল ভক্ষণ করা হয় এমন সব সবজিঃ বাঁধাকপি, ফুলকপি, লালশাক, ডাঁটা, পুই, পালংশাক ইত্যাদি।
মূল জাতীয় ফসল	:	ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড ও শিকড় ভক্ষণ করা হয় এমন সব ফসলঃ গোল আলু, মিষ্টি আলু, মেটে আলু, কচু, মূলা, আদা ইত্যাদি।
ফল শ্রেণীভুক্ত ফসল	:	ফল ভক্ষণ করা হয় এমন সব সবজিঃ বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়শ, লাউ, শশা ইত্যাদি।

৬.৩ বিচিত্র ফসলের আবাদ

এই পদ্ধতিতে কোন খামারের যথাসম্ভব বেশি প্রজাতি (বিভিন্ন ধরনের ফসল) ও জাতের (যেমনঃ বিভিন্ন জাতের ধান) ফসল আবাদ করা হয়। এর ফলে রোগ-পোকা জনিত সমস্যা কমে যায় এবং কোন কারণেই খামারের সমস্ত ফসল বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বিচিত্র ফসলের আবাদ কার্যে পরিণত করতে খামারটিকে কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করে সংখ্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশে খামারের গড় আয়তন ও পরিবেশগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রতিটি খণ্ড (প্লট) এক বিঘা কিংবা তার কম হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

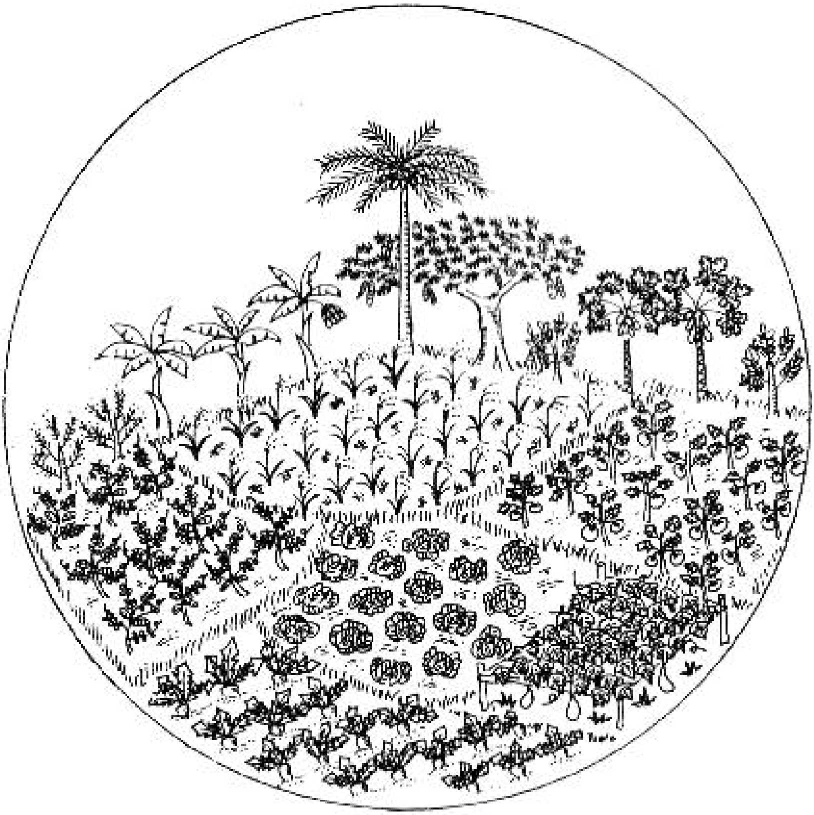

৬.৪ শস্যাবর্তন/শস্য পর্যায়

একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের আবাদকে শস্য পর্যায় বলে। এ ধরনের শস্য চাষ পদ্ধতির অনুশীলনে মাটির উর্বরাশক্তি অক্ষুণ্ন থাকে, মাটিতে গৌণ পুষ্টি-উপাদানের ঘাটতি দেখা দেয় না এবং কোন বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে না। একটি উত্তম শস্য পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে প্রতিটি ফসলের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখা উচিত। দুটি বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে:

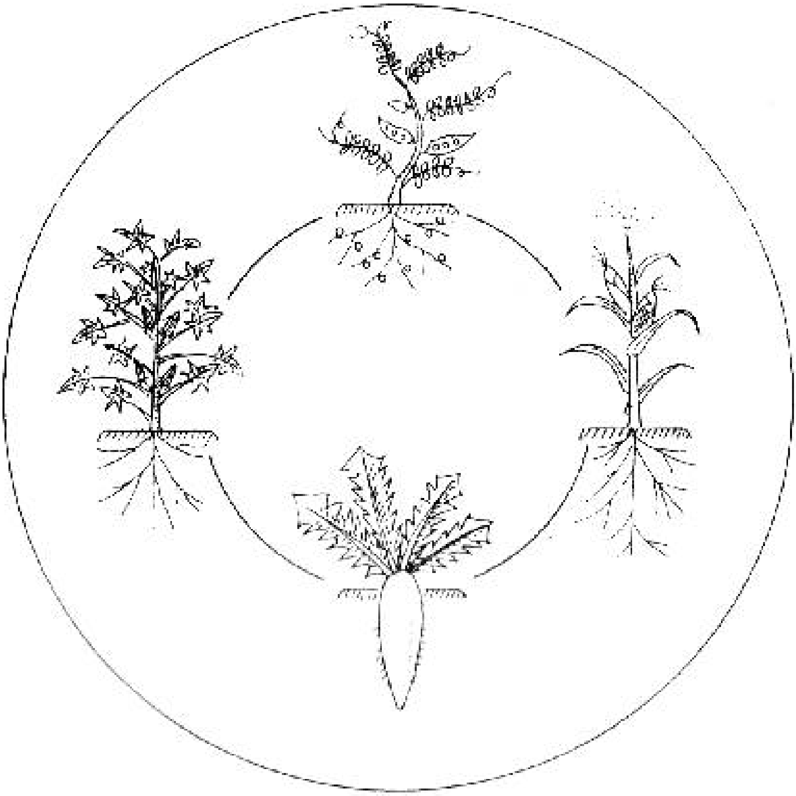

যার একটি হ'ল ফসল কর্তৃক পুষ্টি গ্রহণের মাত্রা। উদাহরণ স্বরূপ, উচ্চ মাত্রায় পুষ্টি-উপাদান গ্রহণ করে এমন ফসল আবাদের পূর্বে কিংবা পরে স্বল্প মাত্রায় পুষ্টি-উপাদান গ্রহণ করে এমন ফসলের আবাদ উত্তম।

পুষ্টি-উপাদান গ্রহণের মাত্রা (ক্রম উচ্চ মাত্রা)

১. শিম/ডাল জাতীয় ফসল

২. ভূনিম্নস্থ কান্ড ও মূল জাতীয় ফসল

৩. পাতা ভক্ষণ করা হয় এমন ফসল

৪. ফসল ভক্ষণ করা হয় এমন ফসল

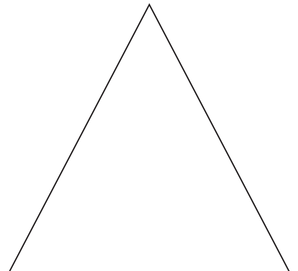

দানা ফসল মাটি থেকে সর্বোচ্চ মাত্রায় পুষ্টি-উপাদান গ্রহণ করে। শিম বা ডাল জাতীয় ফসল মাটি থেকে সবচেয়ে কম পুষ্টি-উপাদান গ্রহণ করে মাটিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। সুতরাং, শস্যাবর্তনে শিম/ডাল জাতীয় ফসল অন্তর্ভূক্তকরণ মাটির উর্বরাশক্তি অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে খুবই সুবিধাজনক।

অন্য বিষয়টি হ'ল ফসলের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা। মাটি রোগজীবাণু দ্বারা দূষিত হলে সেখানে রোগপ্রতিরোধী ফসলের আবাদ করা প্রয়োজন। (যেমনঃ রোগাক্রান্ত জমিতে দানা ফসলের আবাদ করা)।

রোগসহিষ্ণুতা (বেশি থেকে কম)

১. দানা ফসল
২. ভূ-নিম্নস্থ কান্ড ও মূল জাতীয় ফসল
৩. শিম/ডাল জাতীয়তা ফসল
৪. পাতা ভক্ষণ করা এমন ফসল
৫. ফল ভক্ষণ করা হয় এমন ফসল

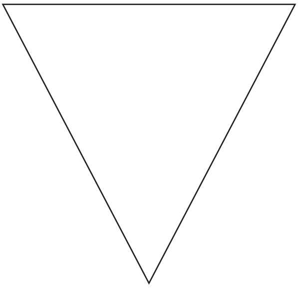

দানা ফসল সবচেয়ে বেশী রোগসহিষ্ণু এবং সবজি হিসাবে ফল ভক্ষণ করা হয় এমন ফসল সবচেয়ে কম রোগসহিষ্ণু। দানা ফসল মাটি শোধন করতে এবং রোগজণিত সমস্যা কমাতে পারে।

(নোট: লাগাতার বিবিধ সবজির আবাদ করা হয় এ রকম ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু লাগাতার দানা ফসল আবাদ করা হয় এ রকম ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। সুতরাং, শস্যাবর্তনে দানা ফসলের অন্তর্ভুক্তি রোগজণিত সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি।)

৬.৫ মিশ্র ফসলের আবাদ

বিচিত্র ফসল আবাদের একটি ভিন্ন রূপ হল মিশ্র ফসলের আবাদ। এ পদ্ধতিতে একই জমিতে বিভিন্ন ফসল একই সংগে আবাদ করা হয়। বিভিন্ন দেশে স্থানীয় চাষ পদ্ধতিতে শিম জাতীয় ফসলের সাথে ভুট্টার চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিটি মিশ্র ফসল

আবাদেরই নিদর্শন ভুট্টা (দানা ফসল) যথেষ্ট লম্বা, গভীরমূলী এবং মাটি থেকে বেশি মাত্রায় পুষ্টি-উপাদান গ্রহণ করে। কিন্তু শিম গাছ তুলনামূলকভাবে কম উচ্চতা সম্পন্ন, অগভীরমূলী এবং মাটি থেকে স্বল্পমাত্রায় পুষ্টি-উপাদান গ্রহণ করে, উপরন্তু মাটিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। এরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে না, বরং ভুট্টাগাছ শিমগাছ দ্বারা সংযোজিত নাইট্রোজেন গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন ফসলের মধ্যে এরূপ উত্তম বিন্যাস পাওয়া যায়।

মিশ্র ফসল আবাদের সুবিধা হল, এতে রোগ পোকার আক্রমণ কম হয় এবং জমি সূর্যালোক ও বৃষ্টির পানি সুষ্ঠুভাবে পায়।

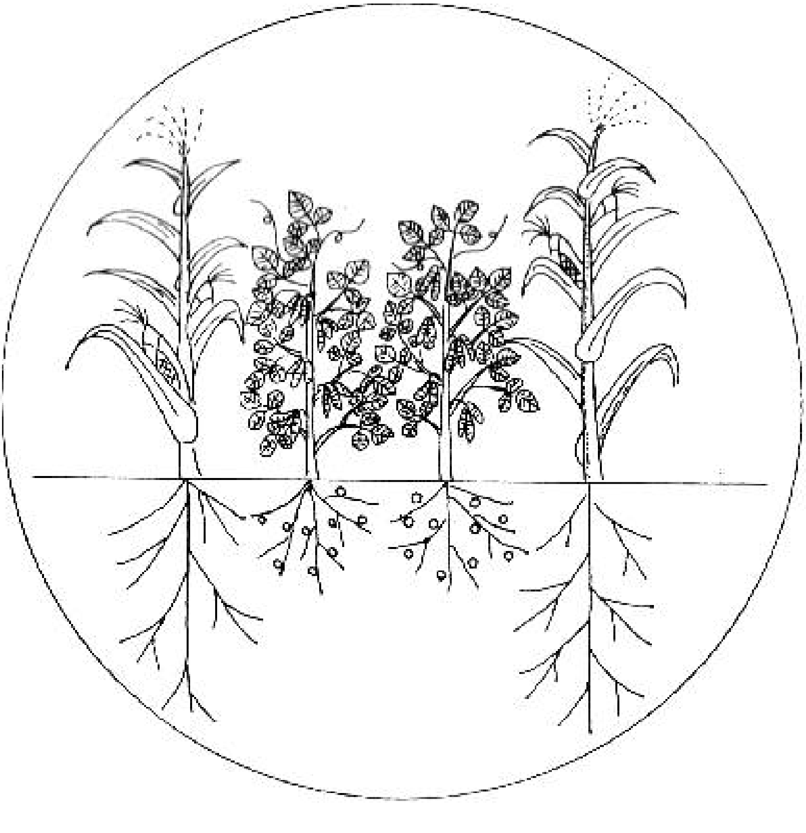

মিশ্র ফসল আবাদের উদ্দেশ্যে ফসল নির্বাচনের জন্য বিবেচ্য বিষয়:

পুষ্টি-উপাদান গ্রহণ:

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মাটির উর্বরাশিক্ত অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দানা ফসল ও ডাল ফসলের বিন্যাস উত্তম। দানাফসল থেকে বেশি মাত্রায় পুষ্টি-উপাদান শোষণ করে কিন্তু ডাল বা শিমজাতীয় ফসল মাটি থেকে স্বল্প মাত্রায় পুষ্টি-উপাদান শোষন করে। আবার লিগিউম ফসল নাইট্রোজেন সংযোজনকারী ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে মাটিতে নাইট্রোজেন সংযোজন করে।

শিকড়ের গভীরতা:

একটি গভীরমূলী ফসলের সাথে আর একটি গভীরমূলী ফসল আবাদ করা হলে একে অপরের সাথে খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করে, ফলে, কোনটিই সুষ্ঠুভাবে বাড়তে পারে না। দুটি অগভীরমূলী ফসল একত্রে আবাদ করলেও অনুরূপ সমস্যা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে একটি গভীরমূলী ফসলের সাথে আর একটি অগভীরমূলী ফসল একত্রে আবাদ করাই যুক্তিসঙ্গত। ভুট্টার সাথে কুমড়া গোত্রের কোন ফসলের একত্রে আবাদ উত্তম। ভুট্টা গভীরমূলী ফসল এবং মাটির গভীর থেকে খাদ্য আহরণ করে। কুমড়া অগভীরমূলী ফসল বিধায় মাটির গভীরের খাদ্য নিয়ে ভুট্টার সাথে প্রতিযোগিতা করেনা। সচরাচর গভীরমূলী ফসল দণ্ডায়মান প্রকৃতির (Standing type) এবং অগভীরমূলী ফসল আনুভূমিকভাবে প্রসারিত প্রকৃতির।

কীটপতঙ্গ বিতাড়ক উদ্ভিদ:

কতিপয় উদ্ভিদের গন্ধে কীটপতঙ্গ বিতাড়িত হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রজাপতি পিঁয়াজের গন্ধ অপছন্দ করে। বাঁধাকপির সাথে পিঁয়াজ আবাদ করা হ'লে পিঁয়াজের গন্ধে প্রজাপতি বিতাড়িত হয়। বাঁধাকপি ও পিঁয়াজের এরূপ বিন্যাসকে সহচর ফসলের আবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রোগ বালাই প্রতিরোধ করতে সহচর ফসলের আবাদ খুবই কার্যকর।

ছায়াসহিষ্ণু ফসল:

কোন কোন ফসল ছায়াতেই ভাল জন্মে। এদেরকে ছায়াসহিষ্ণু ফসল বলে। বৃক্ষ বা কোন দীর্ঘকায় ফসলের নীচে ছায়াসহিষ্ণু ফসলের আবাদ জমিকে অধিকতর কাজে লাগায়। কাঁঠাল গাছের নীচে আনারস এবং আমগাছের নীচে আদা ছায়া সহিষ্ণু ফসল আবাদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বাংলাদেশে মিশ্র ফসলের উত্তম বিন্যাস

প্রধান ফসল		উত্তম সহচর
সরিষা	:	মসুর, মূলা, খেসারী
মরিচ	:	মাসকলাই, মূলা, ঢেঁড়শ, বেগুন
বাঁধাকপি	:	পিঁয়াজ, টমেটো, ধনে, গোলআলু
ফুলকপি	:	আলু
ভুট্টা	:	চীনাবাদাম, শিম, মুসুর, মুগ, মাসকলাই, মিষ্টিকুমড়া
টমেটো	:	পিঁয়াজ, রসুন, গাজর, শশা
শশা	:	মূলা, ভুট্টা, ডাল ফসল, টমেটো
ইক্ষু (আখ)	:	মুসুর, চীনাবাদাম, খেসারী
বেগুন	:	ডাল ফসল, মরিচ, আলু
আলু	:	ডাল ফসল, বাঁধাকপি, মটর, ভুট্টা, বেগুন
দেশী শিম	:	ভূট্টা
চীনাবাদাম	:	ভুট্টা, আখ
মূলা	:	শশা, সরিষা, টমেটো, মরিচ
মসুর	:	সরিষা, ভুট্টা, আখ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা

বর্তমান কৃষি অনুশীলনের ব্যাপারে তথাকথিত ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও রোগের প্রাদুর্ভাব একটি গুরুতর সমস্যা। রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে কৃষক বিষ ব্যবহার করে থাকে; কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয় না বরং দুষ্টচক্রের মতন সমস্যার ক্রমশ: অবনতি ঘটে। এরূপ কেন হয়?

প্রথমত: কৃষিসম্পর্কিত গবেষণাগারগুলি, রোগ পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটার পর, সমস্যার মূল কারণ বিবেচনা না করে, কিভাবে এদেরকে দমন করা যায় তার উপর গুরুত্বারোপ করে। মূল কারণ বিবেচনা না করে কোন সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত: গবেষক একটি সত্য কখনই বুঝতে পারে না যে, কেবল সুস্থ পরিবেশই সুস্থ উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে এবং সুস্থ উদ্ভিদ কখনও সহজে রোগ পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় না-হলেও ক্ষতির পরিমাণ থাকে খুবই সীমিত।

আমাদের উচিত রোগ পোকা জনিত সমস্যার দুষ্টচক্রটিকে (Vicious Cycle) অতিক্রম করে স্থায়ী সমাধানের একটি পথ খুঁজে বের করা।

একই সাথে আগাছা কথাটিকেও পুনর্বিবেচনা করা উচিত, কারণ আগাছাকেও অনেকে আপদ বলে গণ্য করে।

এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়:

১. রোগ পোকা জণিত সমস্যার স্বরূপ

২. রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সৃষ্ট দুষ্টচক্র (Vicious Cycle)

৩. প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ:

$\Rightarrow$ প্রতিরোধী ব্যবস্থা

$\Rightarrow$ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

৪. আগাছা এবং তারা আমাদের কী শিক্ষা দেয়

৭.১ আপদ বলতে কী বুঝায় এবং এদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাটি কি?

মানুষের ধারণা যেসমস্ত রোগ-জীবাণু এবং কীট পতঙ্গ ফসলের ক্ষতি করে সেগুলো সর্বতোভাবেই ক্ষতিকর। এ ধারণাটি কি আদৌ ঠিক? শুধুমাত্র মানুষের সুবিধার কথা বিবেচনা করলে এ ধারণাটি ঠিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। বিশ্বপ্রকৃতির পরিবেশ-পদ্ধতিতে সবকিছুই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সকল উপাদানই (জীব এবং জড়) অতীত প্রয়োজনীয়।

পরিবেশ-বিজ্ঞানের পরিভাষায় তথাকথিত ক্ষতিকর কীটপতঙ্গসমূহ প্রথম শ্রেণীর ভোক্তা (Consumers of First Order)। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে, খাদ্যশৃঙ্খলে কীটপতঙ্গের ভূমিকা মোটেই ক্ষতিকর নয়। বরং তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। প্রথম শ্রেণীর ভোক্তাদের অনুপস্থিতিতেই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোক্তারা বাঁচতে পারে না এবং খাদ্যশৃঙ্খল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পরিবেশের ভারসাম্য নিখুঁতভাবে বজায় আছে এমন স্থানে কীটপতঙ্গের সংখ্যা একটি সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে- যে সংখ্যা কখনও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু (পরিবেশ-পদ্ধতিতে) বাহির থেকে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করা হলে সহসা কীটপতঙ্গ আবির্ভূত হয় এবং ফসলের ক্ষতিসাধন করে। এ ঘটনাটিকে গভীরভাবে

লক্ষ্য করলে আমরা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবো যে, কীটপতঙ্গ কোন সমস্যা নয় বরং পরিবেশে ভারসাম্যহীনতার কারণেই ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ সংখ্যায় বৃদ্ধির সুযোগ পায়। আমাদের যেসমস্ত কাজ পরিবেশে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে, কীটপতঙ্গ সেগুলো সনাক্ত করে দেয় বলে এদেরকে শিক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং কীটপতঙ্গকে ক্ষতিকর বলে বিবেচনার করার এবং এদেরকে ধ্বংস করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কেন সহসা কীটপতঙ্গ আবির্ভুত হয়।

উদ্ভিদের রোগের কারণ হিসাবেও এই একই কথা প্রযোজ্য। বিশেষ অণুজীব কিংবা তথাকথিত রোগজীবাণুর প্রাদুর্ভাবের ফলেই (নিমাটোড, ছত্রাক, ভাইরাস ইত্যাদি) উদ্ভিদ রোগাক্রান্ত হয়। প্রকৃতিতে সাধারণত: এদের সংখ্যা খুব সীমিত। সুতরাং, এরা উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর নয়। শুধুমাত্র মাটির পরিবেশ-পদ্ধতি বিঘ্নিত হলেই রোগ জীবাণুর প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং তখনই উদ্ভিদ রোগাক্রান্ত হয়। মাটিতে রোগজীবাণুর অস্তিত্ব থাকাটা কোন সমস্যা নয় বরং মাটির পরিবেশ-পদ্ধতিতে বিঘ্ন ঘটিয়ে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করাটাই সমস্যা। সুতরাং, উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল মাটির পরিবেশ-পদ্ধতিতে বিঘ্নসৃষ্টিকারী কাজগুলি (লাগাতার ফসল আবাদ, রাসায়নিক সার, বিষ ইত্যাদির ব্যবহার) পরিহার করে, মাটির অভ্যন্তরে উপাদানগত ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করা।

৭.২ রাসায়নিক পদ্ধতিতে আপদ দমনের ফলে উদ্ভূত দুষ্টচক্র

বর্তমানে রাসায়নিক কৃষির অনুশীলনে রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। উক্ত কাজে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জড়িত:

১. রাসায়নিক বিষের ব্যবহার করা হয়, যা সকল জীবের জন্য ক্ষতিকর

২. বর্তমান সমস্যার সরাসরি সমাধান খোঁজা হয়

৩. সমস্যার মূল কারণ বিবেচনা করা হয় না

কেন রাসায়নিক বিষ প্রয়োগ করে তথাকথিত রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এবং কেন সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে তা নিয়ে আমরা বিস্তা আলোচনা করব।

৭.২.১ কীটপতঙ্গ

কথিত ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের বৈশিষ্ট্য হ'ল একবারে বহুসংখ্যক ডিম উৎপাদন করা এবং দ্রুত জীবনচক্র সম্পাদন করা। এ বৈশিষ্ট্যের জন্যই এদের দেহে খুব তাড়াতাড়ি বিষপ্রতিরোধী শক্তি জন্ম নেয়। সুতরাং, পুনরায় এদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে, কৃষক অধিক মাত্রায় বা অধিক শক্তিশালী বিষ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তী নতুন বংশধররা একেবারে বিষপ্রতিরোধী হয়ে জন্ম নেয়। আর একটি কারণ হল, বিষ ব্যবহারের ফলে পতঙ্গভুক প্রাণীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (মাকড়, ব্যাঙ, পাখী ইত্যাদি)। ফলে প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। পতঙ্গভুক প্রাণীরা সংখ্যা কম এবং তাদের জীবনচক্র তুলনামূলক ধীরগতিসম্পন্ন বলে তাদের বংশবৃদ্ধির হারও কম। কীটপতঙ্গের দেহে যেরূপ দ্রুত বিষপ্রতিরোধী শক্তি জন্ম নেয়, পতঙ্গভুক প্রাণীর দেহে অনুরূপ বিষপ্রতিরোধী শক্তি জন্ম নেয় না বলে বিষক্রিয়ার ফলে পতঙ্গভুক প্রাণীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এর ফলে পরিবেশে যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়, তাতে শুধুমাত্র ক্ষতিকর কীটপতঙ্গেরই প্রাদুর্ভাব ঘটে।

বিষ ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট দুষ্টচক্র শুধুমাত্র কীটপতঙ্গের সমস্যা জটিল করে তোলে না, তা মানব স্বাস্থ্যের জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করে। যে কৃষক সরাসরি বিষপ্রয়োগ করে, প্রথমেই সে আক্রান্ত হয় এবং যারা এই বিষাক্ত খাবার খায় তারাও পর্যায়ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭.২.২ উদ্ভিদের রোগ

উদ্ভিদের রোগের ক্ষেত্রেও কম-বেশি একই সমস্যার উদ্ভব হয়। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে কখনও রোগ নিরাময় করা সম্ভব নয়। রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে একই দুষ্টচক্রের উদ্ভব হয়। যেমন:

১. পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট রোগজীবাণুগুলি নিজেদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে পারে এবং পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে। রোগজীবাণু সহজেই নিজেদের দেহে বিষপ্রতিরোধী শক্তি জন্ম দিতে পারে।

২. উপকারী অণুজীব ক্ষতিকর জীবাণুদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। বিষ প্রয়োগের ফলে উপকারী অণুজীব মারা যায় এবং অণুজীবদের অভ্যন্তরীণ পরিবেশও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

৩. নতুন রোগজীবাণুর সৃষ্টি এবং রোগজীবাণুর মধ্যে বিষপ্রতিরোধী ক্ষমতা জন্ম নেওয়ার ফলে অণুজৈবিক পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষণিকের জন্য রোগ পোকার প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে রাখা গেলেও এর দ্বারা কখনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না। পরিবেশসম্মত উপায়ে সমস্যা বিশ্লেষণপূর্বক মূল কারণ বিবেচনা করেই রোগা পোকা জনিত সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

৭.৩ পরিবেশসম্মত উপায়ে রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা

ছবি

রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনার প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে “রোগপোকা জনিত সমস্যা” বলতে কোন কথা নাই। খামারে পরিবেশগত ভারসাম্য বিঘ্নিত না হলে রোগের কারণ

কিংবা পোকার উপস্থিতি কোন সমস্যা নয়-তবে লক্ষণ বটে। এরূপে রোগ কিংবা পোকার লক্ষণ দেখা দিলে এর মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিঘ্ন সৃষ্টিকারী উপসর্গগুলি দুর করতে হবে। এভাবে সমাধানের পথ খুঁজলে পরবর্তীকালে সমস্যা এড়ানো সম্ভব। রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের উপায় দুটি-প্রতিরোধ এবং নিরাময়। প্রতিরোধক ব্যবস্থাপ উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। তবে পরিবেশসম্মত কৃষির প্রাথমিক পর্যায়ের অনুশীলনে নিরাময় পদ্ধতির ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে। যদি যথাযথভাবে প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তবে নিরাময় পদ্ধতি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় না।

৭.৩.১ প্রতিরোধক ব্যবস্থা

এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফল পরোক্ষভাবে অর্জিত হয়। প্রতিরোধক ব্যবস্থার ফলাফল সরাসরি অর্জিত হয় না বলে কৃষক এ পদ্ধতি ব্যবহারে ততটা উৎসাহী নয়। পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে এটিই রোগ পোকা জনিত সমস্যা নিরসনের একমাত্র স্থায়ী ব্যবস্থা। সুতরাং, প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপরেই সর্বাধিক (৯০% এর বেশী) গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

খামারের ভারসাম্যের পরিবেশ তৈরি করা

খামারে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বৈচিত্র। এক্ষেত্রে, যে সকল উপাদান ভারসাম্য বিঘ্নিত করে সেগুলো পরিহার করা উচিত। খামারের অভ্যন্তরে ভারসাম্য বজায় রাখার পদ্ধতিগুলো হল:

১. বিচিত্র ফসলের আবাদ করা (৬.৩)

২. কীটপতঙ্গ বিতাড়ক ও ভেষজ উদ্ভিদ সহ মিশ্র ফসলের চাষ (৬.৫)

৩. বহুবর্ষজীবি গাছ ও ঘাস লাগানো (৫.৫)

৪. রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহার না করা (৫.১)

মাটিস্থ অণুজীবদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা

মাটিস্থ অণুজীবসমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাটাই হল সুস্থ উদ্ভিদ জন্মানোর মূল কথা।

মাটিতে জৈবপদার্থের অভাব একই ফসলের লাগাতার আবাদ এবং বিষ ব্যবহারের ফলে মাটিস্থ অণুজীবদের মধ্যে সৃষ্ট ভারসাম্যহীনতাই অধিকাংশ উদ্ভিদ-রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। মাটিস্থ অণুজীবসমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পদ্ধতিসমূহ হ'ল:

১. শস্যাবর্তন/শস্যপর্যায় (৬.৪)

২. নিয়মিত জৈব পদার্থ সরবরাহ (৫.১)

৩. মাটিতে তাজা জৈব পদার্থ ব্যবহার না করা (৫.১)

৪. রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহার না করা (৫.১)

অন্যান্য বিষয়:

১. উৎকৃষ্ট মানের বীজ ব্যবহার

২. সঠিক সময়ে বীজ বপন/চারা রোপণ

৩. সঠিক দূরত্বে চারা রোপণ/বীজ বপন

প্রকৃতপক্ষে, অতি সহজে রোগ পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটে না। এদের প্রাদুর্ভাবের কারণ বিচিত্র ও জটিল। যদি কখনও আমাদের ফসলে রোগ পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটে, তাহলে, উক্ত ফসলটি উৎপাদন করতে যে পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে, সে ভুলটি সংশোধন করা উচিত। কীটপতঙ্গ ও রোগ আমাদের ভুল কাজগুলির নির্দেশক হিসাবে কাজ করে কিন্তু তারা নিজেরা কোন সমস্যা নয়।

৭.৩.২ নিরাময় পদ্ধতি

পরিবেশ-সম্মত কৃষি অনুশীলনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও রোগ পোকা জনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারণ, প্রাথমিক অবস্থায়, রাসায়নিক কৃষি অনুশীলনের ফলে, রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব থেকে খামার পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে না এবং খামারে সম্পূর্ণরূপে পরিবেশগত ভারসাম্য তৈরি হয় না। এমতাবস্থায় ফসল রক্ষার জন্য নিরাময় পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে।

ভৌত নিয়ন্ত্রণ
এ পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ এবং কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাবের প্রাথমিক পর্যায়ে খুবই কার্যকর:

১. জাল দ্বারা কিংবা হাতের সাহায্যে পোকা ধরে মেরে ফেলা।

২. আলোর ফাঁদ: রাতের বেলা একটি গামলা বা বালতি ভরতি পানির উপর আলো জ্বেলে রেখে দিলে আলোর কাছে পোকা এসে পানিতে পরে মরে যায়।

৩. ফসলের জমিতে কিছু দূরে দূরে কাঠি পুঁতে রাখলে কাঠির উপর পাখি বসে এবং পোকা ধরে খায়।

৪. কাক তাড়ুয়া: ফসলের ক্ষতি করে এমন সব পাখীদের তাড়ানোর জন্য এটি খুবই কার্যকর।

৫. পোকার আক্রমণ এড়ানোর জন্য জাল দিয়ে ফসল ঢেকে রাখা।

প্রাকৃতিক কীটনাশক
ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ তাড়ানো কিংবা মেরে ফেলার জন্য প্রকৃতিতে বহুবিধ উপকরণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সচরাচর ব্যবহৃত হয় এমন প্রাকৃতিক কীটনাশকগুলি হল:

১. ছাই

২. নিমের পাতা ও বীজ

৩. তামাক পাতা

৪. পাটের বীজ

৫. মরিচ

৬. বিষকাঠালী

৭. স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত অন্যান্য পাতা।

কীটনাশক তৈরীতে গাছের পাতা ব্যবহারের নিয়ম হল এদের নির্যাস বের করার জন্য এক রাত পানিতে ভিজিয়ে রাখা এবং প্রাপ্ত রস কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করা।

Natural Crop Protection in the Tropics by Gaby Stoll is a very appropriate book for natural pesticides (Margraf Publishers, Muhlstr, 9, D-6992 Weikersheim Germany).

৭.৪ আগাছা

তথাকথিত ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও তথাকথিত আগাছার প্রতি মানুষ কম বেশি একই ধারণা পোষণ করে। কৃষকের ধারণা আগাছা ফসলের শত্রু। সর্বদাই তারা যেকোন ফসলের জমি আগাছামুক্ত রাখতে এবং পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করতে চায়, যাতে কৃষি জমিতে কোন আগাছার অস্তিত্ব না থাকে এবং এটাকেই সুন্দর বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এ কাজ প্রকৃতির জন্য সুন্দর কি-না কিংবা প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্যও সুন্দর কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

শুধুমাত্র মানুষের স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ঘাস "আগাছা" নামে অভিহিত। কারণ আমরা যে সমস্ত স্থানে তাদের উপস্থিতি অপছন্দ করি সে সমস্ত স্থানেও তারা জন্মায়। সে যাই হোক, প্রকৃতিতে আগাছা মঙ্গলকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবাদী ফসল যেসমস্ত প্রতিকূলতা সহ্য করতে পারে না, আগাছা সেই সমস্ত প্রতিকূলতা পাটিয়ে উঠতে পারে। যেমনঃ খরা, মাটির অম্লত্ব, হিউমাসের স্বল্পতা, পুষ্টি-উপাদানের ঘাটতি কিংবা কোন বিশেষ খনিজের আধিক্য ইত্যাদি। মাটি রক্ষণাবেক্ষণে মানুষ যেসমস্ত ভুল করে থাকে, আগাছারা ব্যাপকভাবে জন্মে সে ভুলগুলি সংশোধন করে দেয়। আগাছা তাদের উপস্থিতি দ্বারা মানুষের ভুল নির্দেশ করে এবং প্রাকৃতিকভাবে সেটি সংশোধনের উপায় বাৎলে দেয়। প্রকৃতি আগাছার মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেয় এবং প্রকৃতির এ শিক্ষাদান পদ্ধতিটি খুবই চমকপ্রদ। আমরা যদি শুধুমাত্র আগাছাদের আচরণ বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে এটা অনুভব করতে পারব যে প্রকৃতি কত নিখুঁতভাবে একটি সমস্যা অতিক্রম করে ভারসাম্যে পৌঁছুতে আমাদের সাহায্য করে।

উৎসঃ Weeds & What They Tell-by E.E. Pfeiffer.

৭.৪.১ আগাছার প্রকৃতি

ভূমিক্ষয় রোধক

আগাছার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল মাটিকে যথাস্থানে ধরে রাখা। প্রবল বর্ষার সময় একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই, আগাছাহীন জমি থেকে বেশী পরিমাণ কাদামাটি (ধুয়ে) চলে যায়। অথচ যে জমিতে আগাছার প্রাচুর্য আছে সে জমি থেকে কোন মাটি ক্ষয় হয় না।

আগাছা প্রকৃতির প্রাথমিক চিকিৎসা

আগাছা, প্রকৃতির ক্ষত সারানোর ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা। আমাদের চামড়ায় কোন ক্ষত হলে, ক্ষতস্থানের রক্তপাত বন্ধ করতে মাংসের উপর একটি পাতলা আবরণের দৃষ্টি হয়। ক্ষত শুকিয়ে গেলে পাতলা আবরণটিও চলে যায়।

অনাবৃত মাটিও প্রকৃতির দেহের ক্ষত এবং আগাছা হল উক্ত ক্ষতকে নিরাপদ করার জন্য পাতলা আবরণ-যা অনাবৃত মাটিকে ঢেকে রাখে এবং মাটিকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। যখন অন্যান্য উদ্ভিদ ও স্থায়ী গাছ জন্মায় তখন আস্তে আস্তে আগাছা অদৃশ্য হয়ে যায়।

মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে আগাছার ধরণও বদলায়। কম উর্বর মাটিতে একই ধরনের আগাছা বার বার জন্মায়। কৃষক যতই নিড়ায়, ঐ একই আগাছা তত বেশী করে আবির্ভূত হয়। প্রশিকার খামারে জমি চাষ না করে লাগাতার তিন বছর ধরে জাবড়া প্রয়োগের ফলে দেখা গেছে, আগাছার ধরন পরিবর্তিত হয়েছে এবং বর্তমানে আগাছা ফসলের জন্য কম ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হচ্ছে।

মাটির উর্বরতার নির্দেশক

প্রতিটি আগাছা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। কতক আগাছা অনুর্বর মাটিতে জন্মায় আবার কতক আগাছা উর্বর জমিতে জন্মায়। আগাছার এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য আমরা আগাছা দেখেই কৃষিজমির উর্বরাশক্তি, PH ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারণা পেতে পারি। উলুঘাস/ছন (Imperata Cylindrica) বাংলাদেশের সর্বত্র দেখা যায় এবং খুব অনুর্বর মাটিতে জন্মিতে পারে। অর্থাৎ, উলঘাস যেখানে জন্মায়, সেখানকার মাটি উর্বর। এমন অনেক আগাছা আছে যারা আমাদের বহু মূল্যবান তথ্য দেয়।

মাটির উর্বরা শক্তির উৎস

কম্পোস্ট ও জাবড়ার উপকরণ হিসাবে আগাছা উত্তম। নিড়ানো আগাছা ফেলে দেয়া একেবারেই ঠিক নয়। কারণ, আগাছা মাটি থেকে পুষ্টি-উপাদান গ্রহণ করে এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে। এর সবটুকুই মাটিতে ফেরৎ দেয়া যেতে পারে। আগাছা মাটিতে ফেরৎ দিলে মাটির উবর্রাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

৭.৪.২ আগাছা ব্যবস্থাপনার গোপন তত্ত্ব

আগাছা ব্যবস্থাপনার মূল কৌশলটি হল মাটি ঢেকে রাখা-যাতে আগাছা জন্মানোর সুযোগ না পায়। এজন্য নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করে আমরা সুফল পেয়েছি।

জাবড়া প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্প কর্ষণ

২ (দুই ইঞ্চি) এর বেশী পুরু জাবড়া (মাল্চ) প্রয়োগে আগাছার সমস্যা ৯০% হ্রাস পায়। জীবন্ত জাবড়া ও আচ্ছাদন-ফসল কার্যকরভাবে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উলুঘাস অপর্যাপ্ত আলোতে জন্মাতে পারে না। সুতরাং শিম বা ভেলভেট শিম উলুঘাস নিয়ন্ত্রণে খুবই কার্যকর।

সবুজ সার

সবুজ সার ব্যবহারে আগাছা কমে যায়। প্রথমত: সবুজ সার-ফসল ঘন করে জন্মানো হয় এবং দ্রুত বর্দ্ধনশীল বলে এর সাথে প্রতিযোগিতা করে আগাছা জন্মিতে পারে না। দ্বিতীয়ত: সবুজ সার মাটিতে মেশানোর সময় আগাছাও মাটির সাথে মিশে যায়। তৃতীয়ত: সবুজ সার মাটির গুণাগুণ পরিবর্তন করে বলে আগাছার ধরনও বদলে যায়। এভাবেই ধীরে ধীরে আগাছা কমে যায়।

রিলে ফসল

ফসল কর্তনের পূর্বেই পরবর্তী ফসলের বীজ বপন বা চারা রোপণকে রিলে ফসল বলে। আমন ধানের সাথে খেসারীর রিলে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত। আমন ধান কাটার সপ্তাহখানেক পূর্বে খেসারীর বীজ বোনা হয়। এর ফলে আগাছা বাড়ার মতন যথেষ্ট সুযোগ পায় না।

আগাছার মাঝে চাষ

এসব ক্ষেত্রে ফসল আর ক্লোভারের সাথে বহু বিভিন্ন ধরনের আগাছা বেড়ে উঠছে। একজন স্থানীয় চাষী ভেবেছিলেন আমার ক্ষেত্রটি আগাছায় ভরে যাবে। কিন্তু, তিনি যখন দেখলেন যে বার্লির গাছ অন্যান্য গাছপালার মাঝে মহাতেজে বেড়ে উঠেছে, তখন অবাক হয়ে গেলেন। কারিগরী বিশেষজ্ঞরাও এখানে এসে দেখেছেন চারধারে আগাছা, কলমি ও ক্লোভারে ভরে গেছে। তারা অবাক হয়ে মাথা নেড়ে চলে গেলেন। কুড়ি বছর আগে, যখন ফলের বাগানের মাটিতে স্থায়ীভাবে সবুজ আস্তরণের কথা বলি, তখন দেশের কোথাও ফলের বাগানে ঘাসের পাতাও দেখ যেত না। আমার বাগানের এমনটি দেখে মানুষ বুঝতে পারল, ঘাস ও আগাছার মাঝেও ফলের গাছ ভালভাবে জন্মানো যেতে পারে। বর্তমানে জাপানের সব ফলের বাগানই সবুজ ঘাসে ভরা। সবুজ ঘাস নেই এমন বাগান বিরল। শস্য ক্ষেত্র সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। মাঠ সারা বছর ক্লোভার ও আগাছায় ঢেকে থাকলেও ধান বার্লি ও রাই ভালভাবে জন্মানো যেতে পারে।

মাসানবু ফুকোয়াকো
একটি তৃণখণ্ডে বিপ্লব

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিজস্ব খামারে বীজ উৎপাদন

সচরাচর নিজস্ব খামারে প্রয়োজনীয় বীজ উৎপাদনের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। কিন্তু পরিবেশসম্মত কৃষি অনুশীলনকারীদের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরী।

প্রথমত: বাজারে প্রাপ্ত বীজে বহু সমস্যা থাকে। যেমন: নিম্নমানের, নির্ভরযোগ্য নয়, অভিযোজন-ক্ষমতা কম, উচ্চ মূল্য ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ফসলের দেশী জাতসমূহের পরিবর্তে উফশী ও সংকর জাতের বীজ ব্যবহার সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর ফলে জিনেটিক ভিত্তির অবক্ষয় ঘটছে-যা ভবিষ্যতের জন্য বিশাল সমস্যা সৃষ্টি করবে।

এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়:

১. বাজার থেকে কেনা বীজের সমস্যা

২. নিজস্ব খামারে বীজ উৎপাদনের গুরুত্ব ও সুবিধা

৩. বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পদ্ধতি

৮.১ উফশী জাতের বীজ, সংকর জাতের বীজ এবং বাজার থেকে ক্রয় করা বীজের সমস্যা

নির্ভরযোগ্য নয় এবং নিম্নমানের

বীজ বিক্রেতাদের কাছ থেকে নিম্নমানের ও ভেজাল বীজ ক্রয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা কম বেশী সকল কৃষকেরই আছে। উদাহরণ স্বরূপ, বাজার থেকে বাঁধাকপির বীজ ক্রয় করে অঙ্কুরোদ্‌গমের পর দেখা গেছে বীজগুলি ছিল সরিষার। এছাড়াও, নিম্নমানের, অঙ্কুরোদ্গমের হার কম, কম ফলনশীল, পুরানো, রোগ পোকা দ্বারা সংক্রামিত ইত্যাদি সমস্যাযুক্ত বীজ বাজার থেকে ক্রয় করে কৃষকের ভোগান্তি বাড়ে। এগুলো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বাংলাদেশে এগুলো সচরাচর ঘটে থাকে। এধরনের খারাপ কিংবা ভুল বীজ ক্রয়ের ফলে একজন কৃষক যদি যথা সময়ে ফসল আবাদ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার পুরো শ্রমই বরবাদ হয়ে যায়।

কম অভিযোজন-ক্ষমতা সম্পন্ন

পরিবেশসম্মত কৃষির জন্য বীজের অভিযোজন-ক্ষমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উফশী ও সংকর জাতের বীজের সমস্যা হল এদের অভিযোজন-ক্ষমতা খুবই কম। উফশী জাতের বীজ কৃষি গবেষণাগারে এবং সংকর জাতের বীজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব খামারে তৈরী করা হয়। উভয় জাতের বীজ অত্যন্ত কৃত্রিম পরিবেশে এবং উচ্চ মাত্রার রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে এদের বৈশিষ্ট্য এমনভাবে পরিবর্তন ও সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, পরবর্তীকালে জৈব সার ব্যবহারে তেমন সুফল পাওয়া যায় না। উফশী জাতের বীজ প্রবর্তনের পূর্বে কয়েকটি প্রজন্ম কৃত্রিম পরিবেশ অতিক্রম করে। ফলে এ বীজগুলি স্থানীয় পরিবেশে অভিযোজন-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এ ছাড়াও, অধিকাংশ সংকর জাতের বীজ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দেশসমূহ থেকে আমদানি করা হয়। যেমনঃ জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড। এসব দেশের জলবায়ু গ্রীস্মমণ্ডলীয় বাংলাদেশের জলবায়ু থেকে ভিন্ন।

ব্যয়বহুল

কৃষক কখনও বাজার থেকে সস্তায় বীজ ক্রয় করতে পারে না। বাজারে স্থানীয় বীজগুলির দাম খুব বেশী আর উফশী ও সংকর জাতের বীজের দাম সচরাচর তার

চেয়েও ৩-৫ গুণ বেশী। সংকর জাতের বীজ ব্যবহার করে পরবর্তী (প্রজন্মের) বছরের জন্য অনুরূপ বীজ সংগ্রহ করা যায় না বলে এগুলি বিশেষভাবে ব্যয়বহুল। কৃষক যদি সংকর জাতের বীজ কিনতে চায়, তবে তাকে প্রতি বছরই বীজ কিনতে হয়। বীজ ব্যবসায়ীদের একটাই লক্ষ্য, কৃষক যেন আমদানী করা সংকর জাতের বীজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

সহজলভ্যতা অনিশ্চিত

প্রতিটি ফসলের বীজ বপনের সময় সুনির্দিষ্ট। যথাসময়ে বীজ বপন করা না হলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রয়োজনীয় সময়ে বীজের সরবরাহ পাওয়া অত্যন্ত জরুরী। বপন মৌসুমের শুরুতেই বাজারে বীজ পাওয়া যাবে কি-না সেটা অনিশ্চিত। অনেক কৃষক এ সমস্যাটির জন্য বীজ সংগ্রহ করতে প্রচুর সময়ের অপচয় করে।

জিনেটিক ভিত্তি (স্থানীয় জাতসমূহ) অবক্ষয়

বাংলাদেশের কৃষিবিদ, কৃষক ও অন্যরা একটি বিষয় এখনও ব্যাপকভাবে অনুধাবন করতে পারে নাই যে, জিনেটিক ভিত্তিক (স্থানীয় জাত সমূহ) সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী। এর প্রধান কারণ দুটি। একটি হল-বিভিন্ন ফসলের বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করতে স্থানীয় জাতসমূহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষিকে টেকসই করার চাবিকাঠি হল ফসলের জাতের বৈচিত্র্য। অন্যটি হল- স্থানীয় জাতসমূহই একটি দেশের প্রকৃত জিনেটিক সম্পদ। স্থানীয় সুফলা জাতের বীজগুলি মূল স্থানীয় জাত থেকেই কৃষক উদ্ভাবন করেছে। স্থানীয় জাতগুলিই আসল এবং অপরিহার্য। এগুলি ছাড়া বীজের কোনরূপ উন্নয়ন সম্ভব নয়। এমনকি স্থানীয় জাতের বীজ ছাড়া উফশী ও সংকর বীজ উদ্ভাবনও সম্ভব নয়।

এ জন্যই স্থানীয় বীজের জাত ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। [নোটঃ শিল্পোন্নত দেশের কতিপয় বিজ্ঞানী এবং বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানীগুলী, স্থানীয় বীজকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং ইতিমধ্যে জিনেটিক সম্পদে সমৃদ্ধ গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় দেশসমূহ থেকে জিনেটিক ভিত্তি হিসেবে স্থানীয় জাতসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ শুরু করেছে]

আমরা যদি স্থানীয় জাতের কার্যকরতা বুঝতে পারি, তাহলে, কোনভাবেই বর্তমান পরিস্থিতি চলতে দেয়া উচিত নয়। কারণ ইতিমধ্যেই মূল্যবান স্থানীয় জাতগুলি হারিয়ে যেতে শুরু করেছে।

৮.২ নিজস্ব খামারে বীজ উৎপাদনের সুবিধা

আমরা যদি ক্রয় করা বীজ, উফশী বীজ ও সংকর বীজের সমস্যা সম্পর্কে পুরাপুরি সচেতন থাকি, তাহলে নিজস্ব খামারে বীজ উৎপাদনের গুরুত্ব ও সুবিধাগুলি বুঝতে পারব।

নির্ভরযোগ্য ও উচ্চ মানের

ব্যবহারকারী (কৃষক) নিজেই বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে বলে এর সবকিছুই তার জানা থাকে (জাত, সংগ্রহ ও প্রক্রিয়ার পদ্ধতি)।

উচ্চ অভিযোজন-ক্ষমতাসম্পন্ন

স্থানীয় পরিবেশে বহু প্রজন্ম অতিক্রম করেছে বলে এর অভিযোজন-ক্ষমতা সম্পর্কে কৃষক নিশ্চিত থাকে। পরিবেশসম্মত কৃষির জন্য, রাসায়নিকের প্রতি সংবেদণশীল বীজকে জৈব পদার্থের প্রতি সংবেদনশীল করাটাই আসল।

কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না

কৃষক নিজের জন্য নিজেই বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। কোন কোন সময়ে উপকরণের জন্য খুবই সামান্য ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে যায়।

সহজলভ্য

কৃষক নিজেই সংরক্ষণ করে বলে যখনই প্রয়োজন হয় তখনই ব্যবহার করতে পারে।

জিনেটিক ভিত্তি সংরক্ষণ

স্থানীয় জাতসমূহ সংরক্ষণের উত্তম উপায় হল-কৃষক তার নিজের প্রয়োজনে এগুলো আবাদ করবে, বীজ সংরক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে তা আবার ব্যবহার করবে।

৮.৩ নিজস্ব খামারে বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া

যে কেউ নিজে বীজ উৎপাদন করতে চাইলে, তাকে এর মূল প্রক্রিয়াগুলি জানতে হবে। নিজস্ব খামারে বীজ উৎপাদনের জন্য গাছ নির্বাচন থেকে গুদামজাতকরণ এবং প্রমাণপত্র তৈরির প্রক্রিয়াগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হল:

ধাপ-১: উদ্ভিদ নির্বাচন এবং চিহ্নিতকরণ

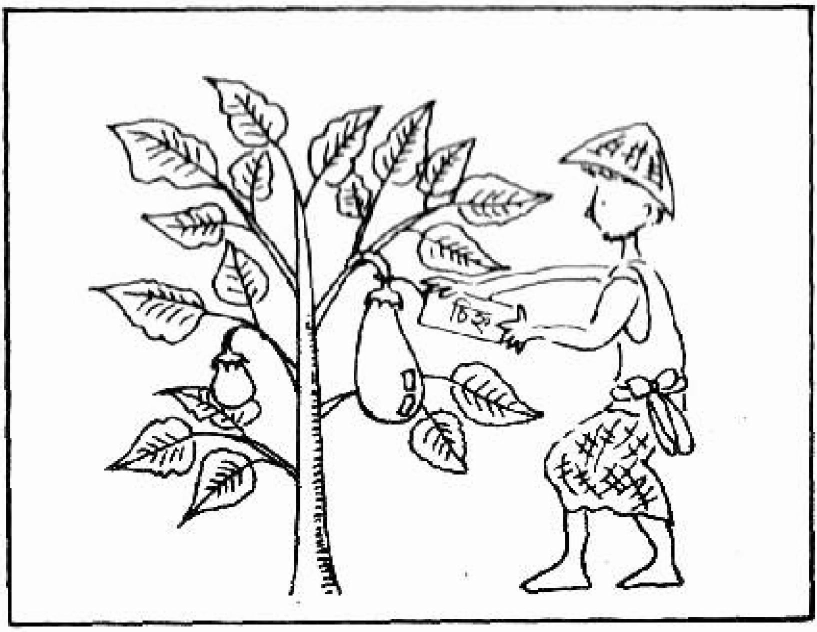

যে গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হবে সেটি নির্বাচন করে চিহ্নিত করাটা প্রাথমিক কাজ। ভুলবশত: ফসল হিসেবে সংগ্রহের হাত থেকে রক্ষার জন্য নির্বাচিত গাছটিকে চিহ্নিত করা হয়। উদ্ধিদ নির্বাচনের পদক্ষেপগুলি হল:

১. সুস্থ গাছ (নিরোগ, পোকা দ্বারা আক্রান্ত নয় এবং অবস্থান স্বাস্থকর)

২. সুফলা উদ্ভিদ (ফসলের/ফলের আকার, আকৃতি ও রং ভাল)

৩. খেতে ভাল

ধাপ-২: বীজ সংগ্রহ

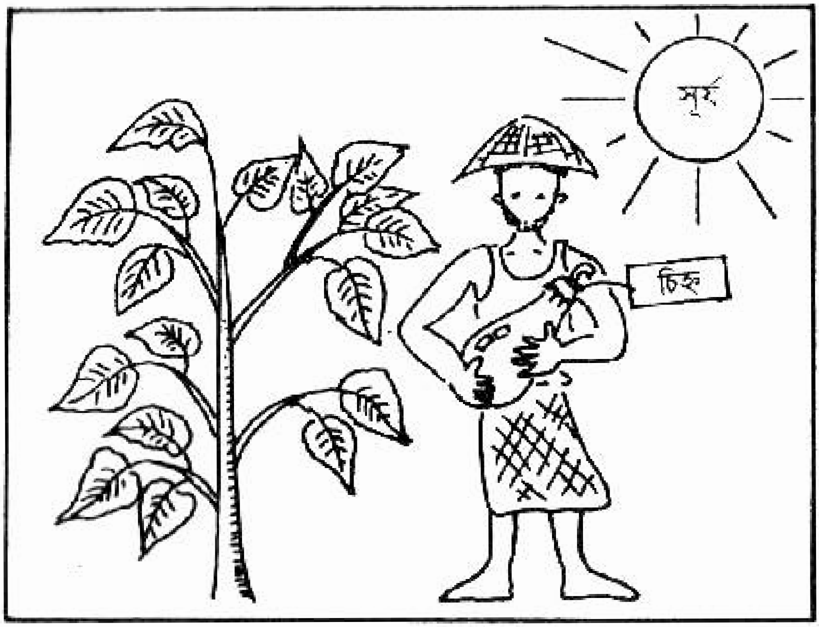

নির্বাচিত গাছটি/ফসলটি পরিপক্ক হলেই সংগ্রহ করতে হবে। এর পদক্ষেপগুলি হল:

১. সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট পরিপক্ক কি-না তা নির্ণয় করা

২. যথেষ্ট রোদ পাওয়া যাবে এমন দিনে সংগ্রহ করা (মেঘলা বা বাদলা দিনে নয়)

ধাপ-৩: বীজ শুকানো

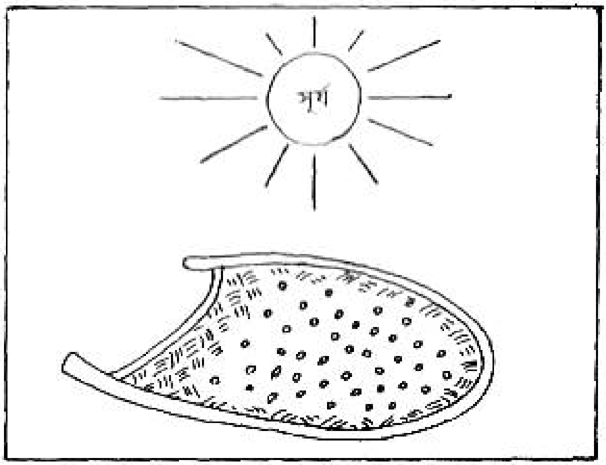

সংগৃহীত বীজ যথাসম্ভব শীঘ্র শুকিয়ে নিতে হবে। কোন কোন বীজ শুকানোর পূর্বে ধুয়ে নিতে হবে (যেমন: টমেটো, পেঁপে)। শুকানোর পদ্ধতির উপর বীজের মান (রোগমুক্ত, ভাল বীজ) নির্ভর করে। এর পদক্ষেপগুলি হল:

১. বীজ রোদে শুকাতে হবে, উনান বা অন্য কিছুর সাহায্যে তাপ দিয়ে নয়

২. বীজ পর্যাপ্তভাবে শুকাতে হবে।

ধাপ-৪: বীজ বাছাই ও শোধন

পর্যাপ্তভাবে বীজ শুকানোর পর, বীজ বাছাই ও শোধন করা দরকার। এ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলি হল:

১. খারাপ বীজগুলো বাদ দিয়ে ভাল বাছাই করা।

২. কীট পতঙ্গের আক্রমণ রোধের জন্য পরিবেশসম্মত উপায়ে শোধন করা।

পরিবেশসম্মত উপায়ে শোধনের উপকরণ

১. শুকনা ছাই

২. শুকনা নিম পাতা

৩. স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত অন্য যে কোন পাতা

৪. অন্যান্য

ধাপ-৫ঃ গুদামজাত করণ

শোধনের পর যথাসম্ভব শীঘ্র, পরিষ্কার, শুকনা, অন্ধকার ও ঠাণ্ডা জায়গায় বীজ সংরক্ষণ করা উচিত।

১. বোতল বা যে কোন বায়ুরোধী পাত্রে বীজ রাখতে হবে।

২. আর্দ্রতারোধক পদার্থের সাথে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। যেমনঃ ভাজা তুষ, শুকনা ছাই ইত্যাদি।

৩. পাত্রগুলি শুকনা, অন্ধকার ও ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

ধাপ-৬ঃ নথিপত্র সংরক্ষণ ও লেবেল লাগানো

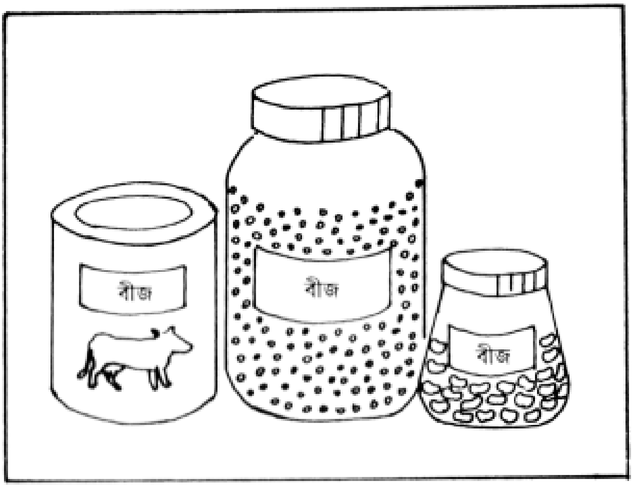

ভবিষ্যতে ব্যবহার ও তথ্যপ্রাপ্তির জন্য নথিপত্র সংরক্ষণ (বীজ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য) ও লেবেল লাগানো (পাত্রের গায়ে নাম লাগানো) প্রয়োজন। লেবেলের গায়ে নিবন্ধন সংখ্যা, বীজের নাম ও সংগ্রহের তারিখ থাকা উচিত।

ইহা ছাড়াও নথিপত্রে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকা উচিত।

১. নিবন্ধন সংখ্যা

২. বীজের নাম (স্থানীয়, ইংরেজী ও উদ্ভিদভিত্তিক)

৩. জাতের নাম

৪. সংগ্রহের তারিখ

৫. সংগ্রহের স্থান

৬. সংগ্রহকারীর নাম

৭ মন্তব্য (বীজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা)

কৃষকের জন্য লেবেল লাগানোই যথেষ্ট। কিন্তু প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সম্মিলিত বীজ সংগ্রহকারীদের জন্য নথিপত্র সংরক্ষণ আবশ্যক।

বাংলাদেশে বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী গাছ

	নাম	বপনকাল	রোপনকাল	মন্তব্য
১.	অড়হর	ফাল্গুন-বৈশাখ	-	সরাসরি বপন
২.	ইপিল-ইপিল	ফাল্গুন-শ্রাবণ	চৈত্র-ভাদ্র	-
৩.	জয়ন্তি	ফাল্গুন-বৈশাখ	বৈশাখ-শ্রাবণ	-
৪.	বগাভোলা	ফাল্গুন-শ্রাবণ	-	সরাসরি বপন
৫.	সজিনা	-	বৈশাখ-শ্রাবণ	-
৬.	বাবলা	ফাল্গুন-বৈশাখ	-	সরাসরি বপন
৭.	মান্দার	-	ফাল্গুন-ভাদ্র	স্টেম কাটিং
৮.	পিঠাকরা	ফাল্গুন-বৈশাখ	বৈশাখ-ভাদ্র	-
৯.	বকফুল	চৈত্র-শ্রাবণ	বৈশাখ-ভাদ্র	-
১০.	রেনট্রি কড়ই	বৈশাখ-শ্রাবণ	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	-
১১.	কাঞ্চন	বৈশাখ-শ্রাবণ	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	-
১২.	মাদ্রী	বৈশাখ-আষাঢ়	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	স্টেম কাটিংও সম্ভব
১৩.	মাছি পাতা	বৈশাখ-আষাঢ়	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	-
১৪.	কলি আমড্রা	বৈশাখ-আষাঢ়	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	-

বাংলাদেশের কাঠ উৎপাদনকারী বৃক্ষ

	নাম	বপনকাল	রোপনকাল	দূরত্ব (ফুট)	উচ্চতা (ফুট)
১.	শিশু	চৈত্র-বৈশাখ	আষাঢ়-ভাদ্র	৩০	৭০
২.	মেহগিনি	চৈত্র-বৈশাখ	আষাঢ়-ভাদ্র	৩০	৮০
৩.	অর্জুন	চৈত্র-বৈশাখ	আষাঢ়-ভাদ্র	৩০	৭০
৪.	নিম	ফাল্গুন-বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	৩০	৮০
৫.	শাল	-	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	৫০	১০০
৬.	সাদা কড়ই	চৈত্র-বৈশাখ	আষাঢ়-ভাদ্র	৩০	৫০
৭.	রাধাচূড়া	-	আষাঢ়-ভাদ্র	৩০	৫০
৮.	কৃষ্ণচূড়া	ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়-ভাদ্র	৪০	৫০
৯.	সেগুন	চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়-ভাদ্র	৪০	৭০
১০.	চম্বল	-	আষাঢ়-ভাদ্র	৬০	১২০
১১.	সোনাইল	বৈশাখ-আষাঢ়	আষাঢ়-ভাদ্র	৩৫	৬০
১২.	জারুল	-	আষাঢ়-ভাদ্র	৩৫	৬০
১৩.	বকুল	বৈশাখ-আষাঢ়	আষাঢ়-ভাদ্র	২৫	৫০
১৪.	হরিতকি	-	আষাঢ়-ভাদ্র	২০	৬০
১৫.	বহেরা	-	আষাঢ়-ভাদ্র	৩০	৬০
১৬.	লাল বন্দনা	ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়-ভাদ্র	২৫	৫০

ছায়ায় জন্মিতে পারে এমন ফসল

	নাম	বপনকাল	রোপনকাল	রোপন দূরত্ব	মন্তব্য
১.	আদা	-	চৈত্র-বৈশাখ	১.৫X০.৭	
২.	হলুদ		চৈত্র-বৈশাখ	১.৫X০.৭	রাইজোম
৩.	কচু	-	ফাল্গুন-বৈশাখ	৩X১.৫	কন্দ
৪.	মরিচ	চৈত্র-বৈশাখ	কার্তিক-মাঘ	৩X১.৫	
৫.	ওল	-	ফাল্গুন-চৈত্র	৩X১.৫	কন্দ
৬.	মেটে আলু	-	চৈত্র-বৈশাখ	৫X৫	অবলম্বন দরকার
৭.	কলমি শাক	চৈত্র-শ্রাবণ	-	১X০.৫	
৮.	আনারস	-	আষাঢ়-ভাদ্র	৩X১.৫	মুকুট/সাকার
৯.	পান	-	আশ্বিন-কার্তিক	১.৫X১.৫	কাটিং
১০.	চই	-	আষাঢ়-শ্রাবণ	৩X৩	কাটিং
১১.	কলা	-	ফাল্গুন-বৈশাখ	৬X৬	সাকার

বাংলাদেশের ফল উৎপাদনকারী গাছ

	নাম	বপনকাল	রোপনকাল	দূরত্ব (ফুট)	উচ্চতা (ফুট)	প্রথম ফল ধরার সময়
১.	কলা	-	ফাল্গুন-বৈশাখ	৬	১০	১
২.	পেঁপে	ফাল্গুন-চৈত্র	চৈত্র-বৈশাখ	৫	৮	০.৫
৩.	কাঁঠাল	জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ	আষাঢ়-আশ্বিন	৩০	৪৫	৪
৪.	আম	বৈশাখ-শ্রাবণ	আষাঢ়-আশ্বিন	৩৫	৬৫	৪
৫.	নারিকেল	ভাদ্র-কার্তিক	আষাঢ়-আশ্বিন	২৫	৮০	৬
৬.	সুপারি	আশ্বিন-কার্তিক	আষাঢ়-আশ্বিন	৭	৫০	৫
৭.	খেজুর	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	সরাসরি বপন	১২	৩০	৫
৮.	তাল	আষাঢ়-ভাদ্র	সরাসরি বপন	৩০	৮০	১২
৯.	আতাফল	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	ভাদ্র-আশ্বিন	১২	২০	৩
১০.	পেয়ারা	শ্রাবণ-ভাদ্র	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১২	২০	২
১১.	আমড়া	আশ্বিন-কার্তিক	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	৩০	৪৫	৩
১২.	জাম্বুরা	ভাদ্র-অগ্রহায়ণ	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	২০	৩০	৪
১৩.	বেল	ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ	বৈশাখ-ভাদ্র	২৫	৩৫	৫
১৪.	সফেদা	জোড়া কলম	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	২৫	৩৫	৫
১৫.	ডালিম	চৈত্র-শ্রাবণ	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	১৫	১৫	২
১৬.	লেবু	গুটিকলম	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	১০	১০	২

	নাম	বপনকাল	রোপনকাল	দূরত্ব (ফুট)	উচ্চতা (ফুট)	প্রথম ফল ধরার সময়
১৭.	জলপাই	ফাল্গুন-চৈত্র	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	২৫	৪০	৫
১৮.	কামরাঙ্গা	ফাল্গুন-চৈত্র	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	২০	৩০	৪
১৯.	তেঁতুল	ফাল্গুন-বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	৩৫	৪০	৫
২০.	লিচু	গুটিকলম	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	৩০	২৫	৪
২১.	জাম	জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	৩০	৪০	৫
২২.	কাউফল	জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	২০	২৫	৬
২৩.	বড়ই	ফাল্গুন-বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	১৬	২০	৫
২৪.	দেওফল	জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	২৫	৩০	৫
২৫.	আমলকি	ফাল্গুন-বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	২০	২৫	৫
২৬.	আঁশফল	জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	২৫	৩৫	৫
২৭.	গাব	আষাঢ়-শ্রাবণ	সরাসরি বপন	১৫	২৫	৪
২৮.	জামরুল	গুটিকলম	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	২০	৩০	৩
২৯.	গোলাপজাম	গুটিকলম	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	১২	২০	৪
৩০.	কাঠবাদাম	-	জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	৩০	৫০	৫

বই এর তালিকা

লেখকের নাম	বইয়ের নাম	প্রকাশক
Masanobu Fukuoka	One Straw Revolution	Rodale Press-1978
	The Natural Way of Farming	Sapan Publications-1965
Bill Mollison	Permaculture I & II	Tagari Publications '78-'79
	Permaculture A Designers manual	Tagari Publications-1988
J.I. Rodale	Pay Dirt	Rodale Press-1945
Sir Albert Howard	An Agriculture Testament	Oxford University Press-1940
	The Soil and Health	Schocken Books-1956
Gaby Stoll	Natural Crop Protection in the tropics	Margraf Publishers-1988
Vandana shira	Staying Alive Woman Ecology and Serival in India	Kali for woman-1988
Ehrentrief E. Pleiffer	Weeds & What they Tell	Rodale Press-1970
John Jeavors	How to grow more vegetables	Ecology Action-1982